মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক মিনি উপন্যাসঃ

মা, মাটি ও ভালবাসা

ফারজানা আহমেদ

স্বাধীনতা , মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম । কথাগুলোর সঙ্গে ভেসে উঠে একজন তরুন, যোয়ান যুবকের অবয়ব ।কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য কি শুধু তরুনরাই যুদ্ধ করেছে? প্রান দিয়েছে ? অথবা বন্দুক হাতে প্রান নিয়েছে শত্রুর ? মা হয়েছে পুত্রহারা ? স্ত্রী হয়েছে স্বামীহারা ? না ! আমি যে গল্প জানি , সে কোন তরুনের গল্প নয় । অতি সাধারন এক তরুনী দেশ ময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে যে একদিন হাতে উঠিয়ে নিয়েছিলো স্টেনগান , যে নিজের জীবন বাজী রেখে বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো দেশকে মুক্ত করতে। সেই "সবিতা" , যাকে সবাই আদর করে ডাকতো "স্বাতী' বলে, তার গল্পই আজ আপনাদের আমি শোনাবো।

তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট স্বাতী । সবার আদরের হলেও অভাবের সংসার । সরকারি চাকরিজীবী রহমান সাহেব । এ জি বিতে অডিটের কাজ করেন ।প্রচুর সুযোগ উপরি পয়সা রোজগার করবার । কিন্তু সমস্ত জীবন কঠিন আদর্শের বেড়াজালে নিজেকে আটকে রাখতে পেরেছেন । জীবনে একটা পয়সা অসতভাবে রোজগার করেন নি। ছেলেমেয়েদেরও একই কথা বলে আসছেন । কম খাবে, কম পরবে তবু অসত হয়ো না। জীবনে কোনদিন ঠকবেনা । মানুষ যখন অসত হয় , কাউকে ঠকিয়ে কিছু করে । প্রকৃতপক্ষে সে ঠকাচ্ছে কাকে? নিজেকে। মনুষ তার কর্মফল জীবিত অবস্থায়ই ভোগ করে যায় ।তাই মাসের শেষে হিমশিম খেয়ে যান তিনি তিন ছেলেমেয়ে আর নিজের খরচ চালাতে গিয়ে ।

তবু স্বল্পভাষী রহমান সাহেবকে দেখলে মনে হয় একজন সুখী মানুষ । শান্তশিষ্ট মানুষটি অফিস আর বাসা ছাড়া সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোতে চেষ্টা করেন বৌ ছেলেমেয়েদের নিয়ে এদিক-সেদিক আত্নীয়-স্বজনদের বাসায় বেড়াতে যেতে। এখন অবশ্য স্বামী-স্ত্রী দুজনই যান ।ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গিয়েছে । যার যার নিজের জগত নিয়েই থাকে সবাই ।বাস্তববাদী রহমান সাহেব বোঝেন যুগ পরিবর্তন হয়েছে ।হয়েছে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন । ছেলে-মেয়েরা সবাই ঠিকমত পড়াশোনা করে যাচ্ছে । এরপর আর চিন্তা কি ?তার দায়িত্ব মোটামুটি শেষ ।এখন একে একে ওরা নিজেদের সংসার শুরু করবে ।দোয়া করেন সবাই সুখী হোক তারা। সময় পেলে মসজিদে যান নামাজ আদায় করতে , অথবা বাসায়ই নামাজ পড়েন রীতিমত ।এরপর রেডিও নিয়ে বসেন । খবর শুনেন ।পত্রিকার পাতা উল্টান । সময় ভালোই কাটে সবকিছু মিলিয়ে।

মা সালেহা বেগম ।চরিত্রের দিক দিয়ে স্বামীর চাইতে একেবারেই বিপরীত হলেও একদিক দিয়ে দুইজনের মিল খুব বেশী । তা হলো স্বামীর এই সৎ জীবন-যপনের প্রতি তার একশোভাগ পক্ষপাতিত্ব আছে। আছে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা । তাছাড়া অসম্ভব হাসিখুশী মিশুক চরিত্রের মহিলা সালেহা বেগম।পুরানা পল্টনে শ্বশুরের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া পাঁচরুমের ছিমছাম বাড়িটা পেয়েছেন সালেহা বেগম।বাড়ীর পেছনে ছোট্ট একটু উঠান । তারই এক কোনে সিম, লাউ আর নানারকম সব্জির গাছ লাগান তিনি ।ছোট্ট একটা বারান্দা । তাতেই ঝুলানো টবে নানান জাতের

ফুলের গাছ ।বারান্দার কোনে কোনে পাতাবাহার গাছ দিয়ে মনের মত সাজিয়েছেন স্বল্প পয়সা খরচ করে হলেও বাসাটা। ঘরের প্রায় সমস্ত কাজ নিজেই সারেন । শুধু সকাল-বিকাল একটা ছুটা মেয়েলোক এসে টুক টাক ধোয়ামোছার কাজগুলো করে দিয়ে যায় । মাসে একটা হলেও বই কিনেন নিউমার্কেট থেকে নিজের পছন্দমত। খুটিয়ে খুটিয়ে তাই পড়েন । সপ্তাহে দু-একদিন বান্ধবীদের বাসায়ও বেড়াতে যান।অথবা কোন বান্ধবী আসেন এক-দুই ঘন্টার জন্য ।গল্প করে চা-নাস্তা খেয়ে সুন্দর সময় কেটে যায় তার ।পঞ্চাশের কিছু বেশী বয়স হলেও এখনও দেখলে বোঝা যায় এককালে রীতিমত সুন্দরী ছিলেন তিনি যা এখনও শেষ হয়ে যায়নি । দুই মেয়ের সঙ্গেই সহজ-সরল ঘনিষ্ঠতা মায়ের ।তবে বড় মেয়ে বিথি পেয়েছে মায়ের চরিত্র ।তাই অধিকাংশ সময় বিথির সঙ্গেই গল্প হয় মায়ের।

বড় ছেলে পলাশ সোজা টাইপের মানুষ ।চারপাশে কি হয়ে যাচ্ছে কোন কিছুতেই যেন তার মনোযোগ নেই। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র পলাশ । তার সঙ্গে মনোযোগী ছাত্র বলে একটানে চান্স পেয়ে যায় বুএটে স্কলারশিপ সহ। আরকিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারীংএ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে পলাশ।পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে প্রাইভেট ফার্মগুলো থেকে মাঝে মাঝে ডাক পড়ছে আজকাল ।টুকটাক কাজ করে যা পাচ্ছে নিজের সমস্ত খরচ চালিয়ে মায়ের হাতেও তুলে দিতে পারছে তার থেকে।ইতিমধ্যে দু-এক জায়গায় দরখাস্তও দিয়েছে ।পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগ দিতে পারবে সে সমস্ত জায়গায়। সবাই ধরেই নিয়েছে এই ছেলের ভবিষ্যত উজ্জল।

বড় মেয়ে বিথি যাচ্ছে কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে ।মায়ের মতই হসিখুশী মিশুক চরিত্র বীথির। বান্ধবীদের সঙ্গে হৈ চৈ করে কাটে দিনের বেশ কতটা সময় ।পড়াশুনায় মোটামুটি, দেখতে রীতিমত সুন্দরী হওয়াতে প্রয়ই এদিক- সেদিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে ওর।বাবা-মা আশা করছেন ইন্টারমিডিয়েট শেষ হতে হতেই বীথির বিয়েটা দিতে পারলে ভালো হয় । ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলে এই মেয়ের খবর আছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় অনেক ছেলেই ওর পেছনে লাগবে।তখন উল্টাপাল্টা কাউকে বেছে নিলে অবাক কিছু নেই ।তাই যতদূর সম্ভব এর আগেই সুযোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারলে সবাই নিশিচন্ত হতে পারবে । কিন্তু ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না । ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর প্রায় তিন মাস অপেক্ষা করতে হয় ফলাফলের জন্য । এরমধ্যে পরিচয় হয়ে যায় বান্ধবী নীলার খালাতো ভাই রবীনের সঙ্গে ।আমেরিকা থেকে মাস্টার্স শেষ করে এসেছে বাবা-মায়ের সঙ্গে সামারের ছুটিতে দুই মাসের জন্য। রবীন নীলার ময়ের খলাতো বোনের ছেলে। ওর মা-বাবার ইচ্ছে ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বৌ নেয়ার ব্যবস্থা পাঁকা করে যাবার । নীলার জন্যই কথা হয় রবীনের জন্য ।নীলা জানতে পেরে চারপাশ অন্ধকার দেখে ।কিভাবে এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় ? নিয়ামুলের সঙ্গে তিন বছর থেকে গভীর প্রেম নীলার ।দুজন মনে হয় মরেই যাবে দুজনকে না পেলে। অথচ পরিবারের সবার প্ল্যান এ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি একটা সিধান্তে পৌছানো। তবে রবীনের পছন্দের ব্যপারটা অবশ্য খুবই জরুরী ।ও যাকে পছন্দ করবে সেখানে বাবা-মা তেমন আপত্তি করবেন না। ছেলে যে দেশে এসে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে সেটাই ওদের কাছে সব চাইতে খুশীর ব্যপার নীলার ছোটবোন শীলার ষোল বছর জন্মদিন উপলক্ষে প্রায় সব আত্নীয়-স্বজনকেই দাওয়াত করেন নীলার পরিবার । সঙ্গে ডাকা হয় ওদের বন্ধু বান্ধবিদেরও । নীলা ডাকে ওর বান্ধবী আনোয়ারা , রুবী ,আশা আর বিথিকে । সবাইই নীলার কাহিনী সম্বন্ধে জেনে যায় । যদি বেকায়দা রকমের পরিতস্থিতি দেখা দেয় ;বান্ধবীরা মিলে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এবং সমাধানের চেস্টা করবে। মনে মনে এই প্রস্তুতি সবার মধ্যে ।

যথা সময়ে রবীনের পরিবার আসে । প্রায় সাত বছর পর দেশে ফিরেছে ওরা । রাজপুত্রের মত রবীনকে দেখে চোখ ফেরাতে পারেনা উপস্থিত সব অবিবাহিত মেয়েরা । নীলার বান্ধবীরা একে অপরের দিকে তাকায় অর্থবোধক দৃষ্টিতে নীলাও যেন কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যায় । যদি রবিন ওকে পছন্দ করে ফেলে বিপদে পড়ে যাবে নীলা । অসম্ভব রুপবান রবীন তারমধ্যে আমেরিকা থেকে ফার্মাসীতে মাত্র পড়াশুনা শেষ করে এসেছে । কোন কিছুরই তো কমতি নেই এই ছেলের । আর ওদিকে নিয়ামুল যদিও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, কিন্তু অতি সাধারন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে ।ইউনিভার্সিটির শেষ মাথাএ আছে এখন । যত ভালো রেজাল্ট নিয়েই বের হোকনা কেন, ভবিষ্যতের কতটা নিশ্চয়তা আছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন । কিন্তু জনেনা নীলা কিভাবে নিয়ামুলকে ফিরিয়ে দেবে । এই দ্বিধাদ্বন্দের মধ্য যখন সময় কাটাচ্ছিলো নীলা; বীথিই তখন ওকে উদ্ধার করলো ।

বাড়ি ভর্তি মেহমান । প্রচুর মানুষকে দাওয়াত করা হয়েছে শীলার জন্মদিনে । আসলে গত সপ্তাহেই শেষ হয়েছে রোজার ঈদ।তাই ঈদ পুনর্মিলন আর জন্মদিন দুটো মিলিয়ে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে ।

নীলার পুরো গ্রুপটাই একসঙ্গে বসে গল্প করছিলো । হঠাত করেই বীথিকে পাওয়া যাছিলো না।কোথায় গেলো

বিথি?

বীথি গিয়েছিলো ওর গ্লাসে নূতন করে সোডা আনতে।এতগুলো মেয়ের মধ্যে রবীনের চোখ আটকে যায় বিথির উপর অনেক্ষন ধরেই রবীনের দুটো চোখ অনুসরন করছিলো বিথিকে । উজ্জল শ্যামলার মধ্যে আশ্চর্য কমনীয় একটা মুখ বীথির। টানা টানা দুটো চোখ , টিকলো নাক , পাতলা দুটো ঠোট , কাঁধ ছাড়িয়ে ঢেউখেলানো একরাশ ছড়ানো চুল। সব মিলিয়ে বীথিকে সত্যি অপূর্ব দেখাচ্ছিলো । আর সবচাইতে বেশী যেটা আকার্ষন করছিলো রবীনকে তা হলো বীথির সাজ । সমস্ত পার্টিতেই সবাই যেন একটা প্রতিযোগিতারয় নেমেছে কার চাইতে কে বেশী ঝক্মকে কপড় আর সাজগোজে নিজেকে আকর্ষনীয়া করে তুলতে পারে। আর সেখানে বীথির পরনে ছিলো আকাশী রঙ্গের জর্জেটের শাড়ী যার পুরোটাতে ছিলো ছড়ানো ছিটানো সাদা চুমকি আর পাথরের কাজ করা । কানে আর গলায় সাদা পাথর বসানো হাল্কা সেট । , দুই হাতে দুই গোছা চুরী । সবার মধ্যে বীথিকে দেখাচ্ছিলো ব্যতিক্রম ।

আশ্চর্য্য একটা স্নিগ্ধ অথচ ধারালো ভাব আছে বীথির পা থেকে মাথা পর্যন্ত যার থেকে চোখ ফেরানো পারছিলো না রবীন । বায়োলজী নিয়ে পড়া ছাত্র রবীন বুঝলো এই মেয়েকে ছাড়া চলবে না ওর ।পনেরো বছর থেকে আমেরিকাতে বেড়ে উঠেছে । পড়াশুনা করতে গিয়ে প্রচুর মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রবীনের। দেশী বিদেশী বহু মেয়েই সবকিছু ছেড়ে এক কাপড়ে চলে আসতে তৈরী আছে রবীন চাইলে । অনেক মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট হলেও আজ পর্যন্ত কাউকেই কথা দিতে পারেনি রবীন। মনের মত কাউকেই সত্যিকথা বলতে গেলে খুঁজে পায়নি ও। নিজেও জানেনা কাকে খুঁজছে ওর চোখ ? আজ যেন হঠাতই আবিস্কার করলো - হ্যাঁ !!! একেই খুঁজছিলো রবীনের সমস্ত অন্তর, ওর দুট চোখ ।ঠিক এমনি একটি মেয়ে শান্ত, স্নিগ্ধ অথচ ধারালো। অনেকক্ষন থেকেই অপেক্ষা করছিলো বীথিকে কিভাবে একা পাওয়া যায়? তখনই কথা বলবে বীথির সঙ্গে । ভয়ে ভয়ে আছে শুধু একটা কারনেই- মেয়েটা বিবাহিত নয় তো আবার? দেখতে ভালো বাঙ্গালী মেয়েদের খুব জলদি বিয়ে হয়ে যায়। মনে মনে প্রার্থনা করছিলো যেনো ওর আশঙ্কা সত্যি না হয় । গ্লাসে সোডা ঢালছিলো বীথি। ; ওরটা শেষ হতে না হতেই নিজের গ্লাসটা এগিয়ে দিলো রবীন কিছু না বলে। স্বাভাবিক ভাবেই নিজের গ্লাসটা ভরে নীচের দিকে তাকিয়েই রবীনের গ্লাসটা ভরে দিলো বীথি।

ধন্যবাদ !!!

শুনে চমকে তাকালো মুখের দিকে ।আর কেমন জড়ো সড়ো হয়ে গেলো বীথি দুটো মুগ্ধ চোখের অপলক চাহনীর এত সামনাসামনি দাড়িয়ে থেকে।পলকহীন চেয়ে আছে সে দুটো চোখ। কিছুই বলছে না মুখে । যেন দুটো চোখই বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে ওর মনের সমস্ত কথা। আর বীথিরও বুঝতে কষ্ট হলোনা সে চোখের ভাষা ।

- বীথি আমার জন্যও একটা গ্লাস ভরে নিয়ে আসিস ! আর এক কোন থেকে চিৎকার করে উঠলো আশা। আশার চিৎকার শুনে চমকে উঠলো দুজনই ।

- আমি রবীন। নীলার কাজীন। আপনি ?

-আমার নাম বীথি ।নীলার বান্ধবী ।

-আর কে এসেছে আপনার সঙ্গে ?

-কেউ না ;কেন?

-না এমনিই ।

-কই ? নিয়ে আয় !!

- হ্যাঁ , আসছি । আচ্ছা যাই ।বলে চলে গেলো বান্ধবীদের ভীড়ে বীথি। মুগ্ধ দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো রবীন বীথির চলার পথের দিকে ।

তারপর আর দেরী না । সে রাতেই নীলাকে জিজ্ঞেস করলো রবীন বীথির সম্বন্ধে ।নীলার ভেতর যেটুকু দ্বিধা ছিলো তাও কাটিয়ে উঠলো নীলা ।বীথির মধ্যে এমন একটা গুন ছিলো যা সচরাচর সবার মধ্যে দেখা যায় না। ওদের সবার মধ্যে বীথিই সবচাইতে চঞ্চল হলেও মনটা ছিলো বীথির নদীর মত টলটলে পরিস্কার ।তাছাড়া বান্ধবীদের মধ্যে যে কেউ যখনই কোন বিপদে পড়েছে তখন বীথিকে দেখা যায় সব চাইতে আগে ঝাপিয়ে পড়তে । এ সমস্ত কারনে বান্ধবীদের সবাইই বীথিকে ভালোবাসে সবচাইতে বেশী ।রবীনই যেচে এসে কথা উঠালো।

খুব ভালো লাগছে আজ এত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তোমার সব বান্ধবীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দিলে না?

-হ্যা ,চলেন । পরিচয় করিয়ে দেই । বলে সবাই যেখানে বসে ছিলো সেদিকে রবীনকে নিয়ে এগিয়ে গেলো নীলা।

-এই হলো আমার বান্ধবী আশা ,ওর নাম আনোয়ারা ও রুবী ।আর বীথি ?বীথি কোথায় ? বীথিকে তো দেখছি না!!! আনোয়ারাই উত্তর দিলো-

বীথিতো বাসায় চলে গেলো । তোকে খুঁজে পাচ্ছিলো না। আগেই নাকি বলেছিলো দশটায় ওকে নিতে আসবে ।যাবার সময় অনেক খুঁজলো তোকে । না পেয়ে খালাম্মার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে ।আমাদের বলে গিয়েছে যেন তোকে জানিয়ে দেই ।

-অত্যন্ত হতাশ হলো রবীন ! যারজন্য এসেছিলো, সেই

যখন নেই আর বসে থেকে কি হবে? তবু জিজ্ঞেস করলো-
- কে পিকআপ করলো? উনার বর বুঝি? কার কথা বলছেন? আমার গ্লাসে যে সোডা ঢেলে দিয়েছিলো , তার কথা?
-সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো হেসেই জবাব দিলো আশা-
-বর কেনো হবে?ওর ভাই ওকে নিতে আসবার কথা ।
-ও আচ্ছা! আমি এখন আসি ।বলে সবাইকে একটু অবাক করে দিয়েই সেখান থেকে কেটে পরলো রবীন ।নিজে যেচে এসেছিলো পরিচিত হতে আবার নিজেই নিরুৎসাহিত হয়ে চলে
গেলো সেখান থেকে । ঠোঁটকাটা আনোয়ারা ফিসফিস করে বললো-
-কি রে নীলা ? তোর রবীন পাখীতো দেখি ছায়াবীথি বনেই নীড় রচনা করতে চায় ।
- ভালোই হলো । আমার কিছু করতে হলোনা ।
তোদেরও দায়িত্ব কমলো ।একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম । বীথির সঙ্গে ভালোই মানাবে রবীন ভাইয়ের ।
নীলার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো ।
সবাই চলে যাবার পর আবার ধরলো নীলাকে রবীন ।
দারুন পার্টি দিয়েছেন খালা ।বাব্বা ! এত মানুষ একসঙ্গে ?
হ্যাঁ ; বাবা-মা মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে এমনি পার্টি দিয়ে থাকেন । ভালোই হলো আপনারা এসেছেন ।
- নীলা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম তোমাকে ।
- কি কথা রবীন ভাই
-তুমি তো জানো দুই পরিবারের মধ্যে কথা হচ্ছে তোমার আমার ব্যপারে ?
-কথাট এত সরাসরি জিজ্ঞেস করাতে লজ্জায় লাল হয়ে গেলো নীলা ।তাহলে কি ওদের ধারনা ভুল ? রবীন কি ওকেই পছন্দ করে ফেলেছে ? উহ ! এখন কি করবে নীলা ? এই মুহুর্তে যদি রবীন ভাই ওকে সিরিয়াসলি প্রপোজ করে ? নীলা কিছুতেই বোধহয় ফিরিয়ে দিতে পারবে না ।সমস্ত যুক্তি-তর্ক শেষ হয়ে যাবে নীলার জীবন থেকে ।শরতচন্দ্রের যুগ বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে । বোধহয় এক মিনিটও লাগবে না নিয়ামূলকে ছেড়ে রবীনের হাত ধরে চলে যেতে । বীথি অবশ্যই দেখতে ভালো । কিন্তু নীলাই বা কম কিসে ? ধবধবে গায়ের রং ওর ,ঝলমলে চেহারা ।বিদেশে বিথির চাইতে নীলাই বেশী মানানসই ।কোন জবাব না দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে রইলো নীলা ।কিন্তু পরের কথাটা শুনে যতটা না আঘাত পেলো, তার চাইতে বেশী হলো অবাক !!!
-তুমি তো জানো না । কিন্তু এটা একেবারেই সত্যি যে কাজীনদের সঙ্গে আমেরিকাতে বিয়ে হওয়া একটা লজ্জার ব্যপার । ওখানে কাজ়ীনদের মধ্যে কোন বিয়ে হয় না । আমি জানিনা আমাদের প্যারেন্টসরা কেন এসমস্ত থিঙ্ক করছেন? খুবই শেইমের কথা ।
- ও আচ্ছা ! তা এখন কি করতে হবে ? যেন কিছু না পেয়েই এই প্রশ্নটা করলো নীলা ।
-তুমিই বলো কিভাবে এটা এড়ানো যায় ?
- আমি তো জানিনা রবীন ভাই । আমার বাবা যা কড়া না !
- যেটা রিয়েলিটি সেটা আমি চিন্তা করেছি । আমি অলরেডী তা মাকে জানিয়ে দিয়েছি ।আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা রিজনে ।
- কি কারনে ?
- তোমার ঐ বান্ধবী ; ঐ যে দেখা হলো সোডার টেবিলে আর চলে গেলো সবার আগে ।ওর কথা বলছিলাম আর কি
- হ্যা ও কি কারো সঙ্গে এনগেইজড নীলা ? কিছু মনে করোনা আমি ডাইরেক্ট তোমাকে প্রশ্ন
করছি বলে ।
- না আমি যতটা জানি, না ।
-ঐ মেয়েটাকেই আমি বিয়ে করতে চাই । আমি বোধহয় মনে মনে অনেকদিন থেকেই বীথিকে খুঁজছিলাম ।প্লীজ ! ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও ।
একটু যেন হিংসার আগুনের আঁচ অনুভব করলো নীলা নিজের ভেতর ।কিন্তু পাশাপাশি ভেসে উঠলো নিয়ামুলের সহজ সরল মুখটা। যেন হাঁফ ছেরে বাঁচলো নীলা । সমস্ত দ্বিধা মুহুর্তে
কাটিয়ে উঠলো । নিজেকে অভিসম্পাদ দিলো । বীথীকে একঝলক দেখেই বিদেশ ফেরত রবীন অকপটে বলে ফেললো ওর ভালোলাগার কথা ।অথচ তিন বছর ও দিনরাত যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলো সেই ভালোবাসাকে কিভাবে উপেক্ষা করবার জন্য তৈরী হচ্ছিলো নীলা ! ছি ! ছি!!
-কি কিছু বলছোনা যে নীলা?
-হ্যাঁ হ্যাঁ । অবাশ্যই পরিচয় করিয়ে দেবো রবীন ভাই । কবে ?
-এস সুন এস পসিবল । আমরা মত্র দু মাসের জন্য এসেছি ।কালকেই কেন না ?
- আচ্ছা চলুন ।কোথায় ? নিউ মার্কেটে ?
- না একটা রেস্টুরেন্টে চলো । আমি ওর সঙ্গে খোলাখোলি কথা বলতে চাই ।
এরপর ঠিক হলো একটা চাইনীজ রেস্টুরেন্টে দেখা করবে ওরা ।
নাস্তার পর পরই চলে গেলো নীলা বীথিদের বাসায় । কিছুক্ষন গল্প করে খালাম্মার কাছে বলে বীথিকে নিয়ে বের

হেয়ে এলো নীলা দুপুর বারোটার দিকে ।কথামত একটা রেস্টুরেন্টে দেখা করিয়ে দিলো নীলা বীথিকে রবীনের সঙ্গে। এরপর আর কি ? ফটাফট মনের কথা বলে ফেলে রবীন বীথির কাছে ।পরের সপ্তাহেই রবীনের বাবা-মা প্রস্তাব নিয়ে যায় বীথির বাবা-মায়ের কাছে ।একমাসের মধ্যে অসম্ভব ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় ওদের । আরো একমাস থেকে চলে যায় রবীন আমেরিকা ।কিন্তু তিন মাসের মধ্যে পাগল হয়ে আবার চলে আসে রবীন বৌ এর টানে । দুইমাস কাটিয়ে যায় শ্বশুর বাড়ী । আবার তিনমাস পর আসে এভাবে তৃতীয় বারে সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করে প্লেনে উঠিয়ে নিয়ে যায় ওর প্রিয়তমা স্ত্রীকে রবীন আমেরিকা।

বছর খানেক পর এসে ঘুরে গিয়েছে বীথি মাসখানেকের জন্য মায়ের বাসায় । শিঘ্রী সালেহা বেগম আর রহমান সাহেব নানী-নানা হতে যাচ্ছেন । প্রাণভরে বাবা-মা দোয়া করেন মেয়ের জন্য । সৃষ্টিকর্তার কাছে মেয়ের সুস্বাস্হ্য ও নিরাপত্তা কামনা করেন ।

দুই

স্কুলের শেষ সীমানায় থাকতেই বাড়ির সবাই বুঝতে পারে এ বাড়ির পিচ্চি মেয়েটি আর সবার মত নয় । অত্যন্ত মেধাবী হলেও আর দুই ভাই বোনের মত পড়াশুনায় ততটা মনোযোগ নেই স্বাতীর ।পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে বান্ধবীদের কাছ থেকে গল্পের বই এনে পড়ে । মঝে মাঝে দেখা যায় মন দিয়ে খবরের কাগজও পড়ছে ।

বাবা-মা দুজনই একটু অবাক হন । অন্য দুই ছেলে-মেয়ের তেমন গল্পের বইএর অথবা বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ নেই । স্বল্পভাষী মেয়ে স্বাতীর চাহিদাও অতি অল্প ।এ বয়সে মেয়েদের যেমন ভালো কাপড়-চোপড় , সাজ-গোজের দিকে ঝোক থাকে ; তার কোনোটাই স্বাতীর মধ্যে নেই ।

কোথাও বেড়াতে গেলেও সে বাসায় খুঁজে বের করে কোন বই অথবা টিভি থাকলে তার সামনেই বসে থাকে । সবাই যখন গল্প বা আনন্দ ঠাট্টায় মগ্ন , তখন কোন এক কোনে বসে হয়তো ম্যাগাজিনের পাতা উলটাচ্ছে স্বাতী ।বাবা-মা , ভাই-বোন সবাই কিছুটা চিন্তিত স্বাতীকে নিয়ে । এর সমাধান কি ? নাকি এটা কেবল বয়সের একটা চেহারা ? ইংরেজীতে যাকে বলে" , ফেইস দেখানো "?কয়েক বছর পর হয়তো আপনি ঠিক হয়ে যাবে । বো্ধ হয় ওকে নিজের মত থাকতে দেয়াই ভালো । স্কুলের গন্ডী ছেড়ে কলেজে উঠবার পর সবাই ভেবেছিলো হয়তো এবার স্বাভাবিক জীবন বেছে নেবে স্বাতী । কিন্তু তা না হয়ে যেন আরো একধাপ এগিয়ে গেলো সে ।তখন ১৯৬৯ সাল । দেশের অবস্থা ভালো না। মাঝে মাঝেই হুমকি আসছে পকিস্তানী শাসকদের কাছ থেকে । ঢাকার রেডিওতে মনকাড়া দেশাত্নবোধক গান হয় । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই শোনে স্বাতী । শেখ মুজিবের জ্বালাধরা বক্তৃতা শুনতে শুনতে হাতের মুঠি শক্ত হয়ে যায় ।মঝে মাঝে দেরী করে বাসায় ফেরে কলেজ থেকে । জিজ্ঞেস করলে বলে" , নোট আনতে বান্ধবীর বাসায় গিয়েছিলাম ।"

পলাশ ইতিমধ্য পাশ করে একটা প্রাইভেট ফার্মে বেশ বড় একটা পোস্টে কাজ পেয়েছে । ভালো পয়সাই পায় পলাশ । সংসারে এখন আর কোন অভাব নেই সালেহা বেগমের । ভাবছেন ছেলেকে বিয়ে করিয়ে ঘরে বৌ আনবেন।কিন্তু কেউ জানতো না দুই বছর থেকে মন দেয়া নেয়া হয়ে গিয়েছে বীথির বান্ধবী আশার সঙ্গে । বীথির বিয়ের সময় সব বান্ধবী মিলেই বলতে গেলে সব প্রস্তুতি নেয়।

গায়ে হলুদের সময় সমস্ত আয়োজন , ঘর সাজানো , এমন কি বিয়ের শপিংএ পর্যন্ত সাহায্য করে আশা , নীলা , রুবী , আনোয়ারা সবাই মিলে। হলুদের স্টেজ সাজাতে গিয়ে আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় আশা আর পলাশ । তারপর বীথির হলুদে আশার গলায় অপূর্ব গান শুনে সাদাসিধা পলাশের মনে রঙ ধরে যায়। আর পলাশের সরলতায় মুগ্ধ হয় মিষ্টি মেয়ে আশা । এই দুই বছরে সেই প্রেমের ডালপালা গজিয়ে প্রায় আকাশ ছোয়া অবস্থা । পরিবারের মধ্যে একমাত্র বীথিই জানতে পেরেছিল এই ভালোবাসার কথা । কারন স্বাতীর এসব দিকে কোন মনোযোগই ছিলো না ।

আজকাল মা প্রায়ই চাপ দিচ্ছেন মেয়ে দেখতে যাবার জন্য । পলাশ অত্যন্ত বিপদের মধ্যে আছে । কারন আশার আসল কাহিনী জানলে কি রাজী হবেন পলাশের পরিবার আশাকে বৌ করে আনবার জন্য ? আশার যখন মাত্র বারো বছর বয়স ওর মা চলে যায় অন্য এক লোকের হাত ধরে ওর বাবার সংসার ছেড়ে ।পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ওদের । তার দুই বছর পর বাবাও বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন সতমা । তখন মেয়েকে নিতে এসেছিলেন আশার মা । কিন্তু আশা ঘৃনাভরে ওর মাকে ফিরিয়ে দিয়েছে । বলেছে ",যেদিন থেকে ওর মা এই বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বাইরে পা রেখেছে , সেদিন থেকেই আশা ধরে নিয়েছে ওর মা মৃতা। তিনিও যেন ধরে নেন আশা বলে তার কোন মেয়ে নেই এবং কোন দিনও ছিলোনা।"

নিজের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আশা । সৎমা গ্রামের কম পড়াশুনা করা মহিলা । আশাকে তেমন ঘাটায় না। নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে । নিতান্ত দরিদ্র পরিবার

থেকে এসে প্রাচুর্যের মধ্য দু-মুঠো ভালো মন্দ খেতে পাচ্ছেন , পড়তে পাচ্ছেন , নিজের সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাবা-মাকে দু পয়সা সাহায্য করতে পারছেন । তাতেই সন্তুষ্ট তিনি । এরমধ্যে একটা ছোট ভাই হয়েছে আশার নূতন মায়ের ঘরে ।আশাই আদর করে ওর নাম দিয়েছে" দুলাল ;"কলেজ থেকে এসে পড়াশুনা ছাড়া বেশীর ভাগ সময় কাটায় আশা ওর পাঁচ বছরের ভাই দুলালের সঙ্গে। দুলাল আশার" কলিজার টুকরা ।" আজকাল প্রায় সময় দুলাল আশার সঙ্গেই ঘুমায় । শিশু দুলালের ভালোবাসার সেতুর মাধ্যমে আশা আর ওর সৎ মায়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে প্রগাঢ় ভালোবাসা আর স্নেহের সম্পর্ক । ভাবলে আষ্ট হয় কিভাবে দুলালকে ছেড়ে ও চলে যাবে এ বাসা থেকে ? অথচ বুঝতে পারছে খুব শিগ্গী ওকে বিদায় নিতে হবে বাবা- মায়ের সংসার থেকে । এর মধ্যে বিথি , আনোয়ারা আর নীলা তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে । বাবা-মা প্রায়ই আশার বিয়ের কথা উঠাচ্ছেন ।এদিকে পলাশের বাবা মাও চাপ দিচ্ছেন পলাশের বিয়ের জন্য । দুজনই অসম্ভবচিন্তায় আছে কে উঠাবে পলাশের পরিবারে আশার কথা ?আশার পরিবারে এ নিয়ে চিন্তা নেই । কিন্তু পলাশের বাবা রহমান সাহেব কঠিন আদর্শের বেড়াজালে নিজেকে বন্দী করে রেখেছেন । পারবেন কি তিনি মেনে নিতে আশাকে ছেলের বৌ হিসাবে ওর সমস্ত কাহিনী জানবার পরও ? পাগলের মত ভালোবাসে ওরা দুজনদুজনকে ।অথচ বাবা-মাকে কষ্ট না দিয়ে কিভাবে রাজী করানো যায় ?চিন্তায় ঘুম নেই পলাশের। বীথিটা দেশে থাকলে চিন্তা ছিলোনা ।

সালেহা বেগমের সংসারের অবস্থা এখন বেশ স্বচ্ছল । বীথিও মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে মা-বাবাকে টাকা পাঠায় । স্বাতীকেও আলাদা করে কয়েক মাস পর পর মানি অর্ডার পাঠাচ্ছে বীথি ।ইচ্ছে করলে অনেক সখ মেটাতে পারে স্বাতী ।কিন্তু যাতায়াতের খরচের জন্য অল্প কিছু টাকা রেখে পুরোটাই মার হাতে তুলে দেয় ও ।জোর করলে বলে- মা , আমার কিছুরই দরকার নেই। লাগলে অবশ্যই চেয়ে নেবো তোমার কাছ থেকে । বীথি অনেক সময় বেশ দামী কসমেটিক্স আর পারফিউমও পাঠায় একটি মাত্র বোনের জন্য । কিন্তু স্বাতী এ সমস্ত জিনিসের দিকে কোন মনোযোগও দেয় না ।

আগের মত আর একলা থাকে না স্বাতী । বেশ কিছু বান্ধবী হয়েছে ওর । প্রায়ই ওরা আসে স্বাতীর কাছে ।সবারই প্রায় একই রুপ । সধারন আটপৌড়ে শাড়ী পড়নে সবার । ঝোলানো ব্যাগে একগাদা কগজ-পত্র ,বই-খাতা নিয়ে ঝড়ের মত যায় আসে ।মেয়েদের স্বাভাবিক কমনিয়তার চাইতে যেন তুলনামুলকভাবে একটু রুক্ষতা লক্ষনীয় ওদের মধ্যে ।

নিজেদের কোনকিছুরই যত্ন নেই মেয়েগুলোর ।অনেকটা ইচ্ছাকৃত অবহেলায় যেন নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে ওরা ।অভিভাবকরা ভাবতে বসেন ওদের নিয়ে ।সমাধান হিসাবে ছেলে দেখেন মেয়ের জন্য । ভবেন ,হয়তো বিয়ের পর সংসারে মনোযোগী হলে কেটে যাবে এসব পাগলামী ।কিন্তু টের পেয়ে এক কথায় নাকচ করে দেয় স্বাতী ।কিছুতেই নাকিএখন বিয়ের জন্য তৈরী নাও । সামনে পরীক্ষা । আর এম,এ পাশ করবার আগে প্রশ্নই উঠে না বিয়ের । চিন্তায় পড়ে যায় সবাই ।সময় বদলেছে ।আগের মত ছেলে-মেয়েদের উপর ততটা জোর খাটাতে চায়না বড়রা। তাছাড়া স্বাতীর ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই কেমন মিইয়ে যায় ।

তিন

১৯৭০ সাল । সারা বাংলাদেশ কাঁপছে তখন । দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং যুব সমাজ ক্ষেপে উঠেছে । চারদিকে মিছিল-শ্লোগান আর চিৎকার-চেঁচামেচি ।দেশপ্রেম ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের মত বাঙালিদের মধ্য । ছোট ছেলে-মেয়েরাও উত্তেজিত হয়ে ঘরে ফিরছে বাইরে থেকে নিত্য নতুন কাহিনী নিয়ে । অর্থ না বুঝেও হাত-পা ছুড়ে শ্লোগান দিচ্ছে...স্বাধীনতা চাই ! স্বাধীনতা চাই !! রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ! রক্ত দেবো ,তবু মান দেবো না ! ভাষা দেবো না জলাঞ্জলী ।

আজকাল স্বাতীকে দেখলে কেমন ভয় হয় বাড়ির সবার । উস্কখুস্ক চুল । সময় নেই অসময় নেই ঘর থেকে বের হয়ে যায় । মাঝে মাঝে আসে ওর মতই একদল মেয়ে নিয়ে । এসেই দরজা বন্ধ করে কি যেন আলাপ করে । কথা বলে ফিসফিস করে । মা বুয়াকে দিয়ে চা-বিসকিট, চানাচুর পাঠিয়ে দেন ।কোন প্রতিবাদ না করেই গোগ্রাসে শেষ করে সবকিছু ।দুই মিনিটে খালি হয়ে যায় বিসকিট চানাচুরের প্লেট । চায়ের কাপ । নিজেরাও বোধহয় জানত না এতটা ক্ষুধার্ত ছিলো ওরা । রাগ করতে পারেন না মা ওদের অনিয়ম দেখে । কেমন মায়া হয় মেয়েগুলোকে দেখলে । বুঝতে পারেন সবই ।কিন্তু থামাতে পারেন না । আসলে থামাতে চান না । সর্বনাশের পথে এগুচ্ছে মেয়েগুলো । সবই জানেন । সবই বুঝেন ।তবু মনে মনে বলেন ... হবে , ওদেরকে দিয়েই কিছু একটা হবে । দেশমাতা যেন ওদের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন কিছু একটা পবার আশায় । ওদের এখন অনেক প্রয়োজন। মা বললেন

- তোমরা সবাই খেয়ে যেও ।-

-অবশ্যই খালা ; ক্ষিদেয় পেটের ভেতর ইঁদুর নাচছে ।

-খুশী হয়ে হাসতে হাসতে চলে এলেন মা ।এটা আবার কেমন উপমা হলো ? রান্নাঘরে গিয়ে বুয়াকে নিয়ে যত্ন করে

খিচুরী আর ভূনা গোস্ত রান্না করেন সালেহা বেগম ।ঘন্টাখানেক পর টেবিল সাজিয়ে ওদের ডাকতে এসে দেখেন স্বাতীর ঘর শূন্য ।চোখ ফেটে জল আসে মায়ের । কোথায় চলে গেলো মেয়েগুলো না খেয়ে ? বসে থাকেন টেবিলে খাবার নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ।আশা করেন হয়তো ফিরে আসবে যে কোন সময় ।কাছাকাছি হয়তো কোথাও কাজে গিয়েছে কিন্তু ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে স্বাতী বেশ রাতে । হাতে সেই বই খাতার বোঝা । কোনদিন এত রাতেও হয়তো দু-একজন মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে । ওদের চোখের দিকে তাকানো যায় না। মুখটা মলিন কিন্তু চোখদুটো যেন জ্বল জ্বল করছে ভাটার মত ।পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া স্যান্ডেল ; বোঝা যায় প্রচুর হাটাহাটিতেই এ দশা হয়েছে ।

-স্বাতীর জন্য আমেরিকা থেকে নূতন স্যান্ডেল পাঠিয়েছে বীথি । কবে থেকে পড়ে আছে ঘরের কোনে যেমনভাবে দেয়া হয়েছে সেভাবেই । এদিকে কোন মনোযোগই নেই ওর । তাই একদিন মা বললেন-

- বীথি যে তোকে স্যান্ডেল জোড়া দিয়েছে, পুরোনো গুলো বদলে সেগুলো পড়িসনা কেনো?

- চলছে,চলুক না মা! যখন দরকার হবে আমি নিয়ে নেবো । একটু ভাত দেবে মা ? খুব ক্ষিধে পেয়েছে ।

অস্থির হয়ে ছুটে যান মা রান্নাঘরে । সুন্দর করে ভাত তরকারী গরম করে টেবিলে সাজিয়ে দেন । ডাকতে এসে দেখেন পা থেকে স্যান্ডেল পর্যন্ত না খুলে ঘুমিয়ে গিয়েছে ।তাকিয়ে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষন চোখের পলক পর্যন্ত না ফেলে মা।

কি মায়াভরা মুখটা ! দেখে যেন সাধ মেটে না । আচলে চোখ মুছে প্লেটে ভাত মাখিয়ে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে ডাকেন মেয়েকে। -স্বাতী , উঠ মা ;একটু খেয়ে নে ।

- মা, খুব ঘুম পেয়েছে । আমি এখন ঘুমাবো । ঘুম থেকে উঠে খাবো ।

- একটু উঠে বস মা । আমি খাইয়ে দিচ্ছি ।

বিছানায় আধো ঘুম নিয়ে উঠে বসে স্বাতী ।মা মুখে তুলে দেন ভাত ।

-কি মজা মা তোমার ভাত! উহ!! কতদিন পর খাচ্ছি ! চোখ মেলে তাকিয়ে হাসে স্বাতী ।

মেয়ের হসিমাখা মুখটা দেখে মনে হয় আকাশের চাঁদও বোধহয় হাসলে এত সুন্দর লাগবে না । সুযোগ পেয়ে মেয়ের মুখে ভাত তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন-

- কোথায় থাকিস সারাদিন স্বাতী ?

-অনেক কাজ মা । মা ,ভাইয়াকে বলো না আমাকে একটা রেডিও কিনে দিতে ?

অবাক হয়ে যান মা ।

-তুই আবার রেডিও দিয়ে কি করবি ?

-গান শুনবো । দেশের গান । কি সুন্দর গান বানিয়েছে আজকাল । শুনেছো মা ?

- তুই রেডিওর গান শুনিস কখন ? তোর তো সময়ই নেই ! ঘরেই তো থাকিস না ।

- ওমা! তারজন্য আবার ঘরে থাকতে হয় নাকি ? যেখানে যাই সেখানেই তো গান হয় । এখন তো দেশের গান ছাড়া চারপাশে আর কিছুই বাজেনা মা ! বুঝলে মা! এবার একটা হেস্ত নেস্ত না হয়ে যাবে না এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই । পূর্ব-পাকিস্তান নাম ইতিহাস থেকে উঠে যাবে এবার । সেখানে লিখা থাকবে" সোনার বাংলাদেশ "। তোমাকে আমি আস্তে আস্তে সব বলবো মা । বইও এনে দেবো পড়তে । অনেক কিছু জানতে পারবে তখন ।

অবাক হয়ে শুনেন সালেহা বেগম স্বাতীর সব কথা ।উচ্ছাসে অনেক কিছু বলে ফেলে স্বাতী মাএর কাছে। কি করে ওরা ? কি প্ল্যান করছে ভেতরে ভেতরে ?দরকার হলে নাকি যুদ্ধ করবে এবার বাঙালি জাতি।

অস্ত্র হাতে নিতে হবে প্রতিটা বাঙালীর । তারই প্রস্তুতি চলছে ভেতরে ভেতরে । যুদ্ধ ছাড়া নাকি এবার গতি নেই। এরজন্য সবচাইতে বেশী যা দরকার তা হলো মনোবল , একতা আর অস্ত্র ।

কেঁপে উঠে মায়ের মন । সেই সঙ্গে জানেনা কি এক স্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে যান সালেহা বেগম । ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আবার স্বাতীর বয়সে । মনে হয় ওদের দলে যোগ দেন । দেশের জন্য কিছু একটা করেন ।

সে রাতে ঘুমাতে পারেন না সালেহা বেগম । পা টিপে টিপে স্বাতীর ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে আসেন একটা বাঁধানো খাতা । রান্নাঘরে বসে সবার চোখের আড়ালে চেষ্টা করেন খাতাটায় চোখ বুলাতে ।দু-এক পৃষ্ঠা পড়েও ফেলেন । অনেক কিছুই মাথায় ঢুকে না । তবু ভালো লাগে পড়তে । কি সব দলের নাম, সাংকেতিক শব্দ আর চিহ্ন দিয়ে ভর্তি । সেভাবেই লুকিয়ে আবার রেখে আসেন খাতাটা স্বাতীর ঘরে ।বিছানায় শুয়ে নানান চিন্তায় বিভোর হইয়ে যান । শেষরাতে আধো ঘুমে আধো জাগরনে স্বপ্ন দেখেন–

আবার যেন অনেক বছর আগের বয়সে ফিরে গিয়েছেন সালেহা বেগম ।স্বাতীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওদের মতই একগাদা বইখাতা নিয়ে । নানা সাংকেত ব্যবহার করছেন কথার মাধ্যমে । সালেহা বেগমেরও একটা সাংকেতিক নাম আছে । আর তা হলো ৩০৪ । সবাই দলের মধ্যে নাম ধরে না ডেকে ওদের নাম্বারগুলোই ব্যবহার করছে । সাড়াদিন ছুটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন তিনি। দেখেন বড়মেয়ে বীথি মা এর জন্য ভাত নিয়ে বসে আছে । মেয়েকে দেখা যাচ্ছে মায়ের চাইতে বেশী বয়স্ক ।

-মা তুমি কোথায় ছিলে সাড়াদিন ?

-একটু ব্যস্ত ছিলাম । ভাত আছেরে মা ? খুব ক্ষিধে পেয়েছে !

- তোমার জন্যই তো ভাত নিয়ে বসে আছি । এসে খেয়ে নাও ।আর এত ছুটাছুটি করো নাতো !

বাধ্য মেয়ের মত খেতে বসে যান সালেহা বেগম ।এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে যায় স্বামী রহমান সাহেবের ডাকে ।

ফযরের সময় হয়ে গিয়েছে । উঠে নামাজ পড় ।আমি মসজিদে গেলাম ।

ঘুম থেকে উঠেও বেশ কিছুক্ষন লাগলো সালেহা বেগমের বাস্তবে ফিরে আসতে ।খুব ইচ্ছে হয় আবার ঘুমিয়ে স্বপ্নের বাকি অংশটুকু দেখে আসতে । উঠে ওজু করেন । জায়নামাজে গিয়ে সময় নিয়ে নামাজ পড়েন । তারপর দুই হাত তুলে মোনাজাত করেন ।

হে সৃষ্টিকর্তা , সব কিছুই তো তুমি করে দিতে পারো ।দাওনা আমার দেশটা স্বাধীন করে ! সবাইকে মুক্তি দাও এই অশান্ত , পরাধীনতার হাত থেকে । ফিরিয়ে দাও আমাদের মুখের হসি !!!

চার

হঠৎ করেই মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য দেশে আসে বীথি । সঙ্গে ফুটেফুটে চাঁদের মত ছেলে" অবিন "কে কোলে নিয়ে । বীথি যেনো আরো সুন্দর হয়েছে দেখতে । মাতৃত্বের আলো ছড়াচ্ছে চোখমুখ থেকে। অসম্ভব খুশী সালেহা বেগম আর রহমান সাহেব ।দেশের তখন অস্থির অবস্থা ।বোনের অগোছালো জীবনযাপন দেখে স্বাতীকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বীথি ।অনেক করে বোঝায় বীথি স্বাতীকে বিয়ের জন্য ।

আমেরিকাতে রবীনের বন্ধু ইকবাল একই কোম্পানীতে কাজ করে । দেখতে শুনতে লাখে এক।এরমধ্যে নিজের বাড়ী কিনে তৈরী ।

এখন শুধু অপেক্ষা একটি বৌএর । বৌ এসে বাড়িঘর সাজাবে এই আশায় নিজে কিছুই কিনছে না । বীথির কাছে স্বাতীর ছবি দেখে প্রতিদিন এসে বীথির হাতে পায়ে ধরছে বোনকে রাজী করিয়ে আমেরিকা নিয়ে আসতে ।দরকার হলে রিটার্ন টিকেট কেটে দেবে বলেছে বীথিকে ।

তবু অন্যকারো দখলে চলে যাবার আগে স্বাতীকে এনে দিতে বলেছে ইকবাল বীথিভাবীকে ।অসম্ভব হাসি-খুশী আমুদে ছেলে ইকবাল বলেছে—

-ভাবী,সারাজীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকবো । প্রতি সপ্তাহে এসে বাটি ভরে পেঁয়াজ কেটে দিয়ে যাবো । দরকার হলে শীতে স্নো আর গরমে ঘাস কেটে দিয়ে যাবো ।ছোট বোনের বর হয়ে এগুলো করা কর্ত্তব্য বলেই মনে করবো । তবু আপনার লক্ষী বোনটাকে আমার চাই ।

ওতো আমার মত না ইকবাল ভাই । স্বাতী হলো আমার পুরো বিপরীত ।বান্ধবীরা ছাড়া বড়ির কারো সঙ্গে তেমন কথাই বলেনা বলতে গেলে ও ।

-আমি ওর বন্ধু হবো ।ওর কোন কথাই বলতে হবেনা ।শুধু সামনে বসে থাকলেই হবে । প্লীজ ভাবী ! একটু দয়া করেন !!!

-বোনটাকে না দেখেই এত পাগল?

- ঠিক আছে । আপনি গিয়ে রাজী করিয়ে আমাকে ফোন দেন। আমি চলে আসবো সঙ্গে সঙ্গে ।

বিশেষ করে এ উদ্দেশ্যেই এবার বীথির দেশে আসা । কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ হতে চললো স্বাতীর সঙ্গে একবারও বসবারই সুজোগ হয়নি বীথির । কোথায় কোথায় যায় ! মাঝে মাঝে ফেরে অনেক রাতে ।

তাই একরাতে বসে থকলো বীথি স্বাতীর সঙ্গে কথা বলবার জন্য । প্রায় দশটার সময় ক্লান্ত, অবসন্য হয়ে বাসায় ফিরলো স্বাতী বীথীই দরজা খুলে দিলো ।

-আরে আপু !! এত রাতে জেগে আছো তুমি ? এখনও ঘুমাওনি?

- কোথায় থাকিস এত রাত পর্যন্ত ? আর মাত্র সপ্তাহ দু-এক পর ফিরে যাচ্ছি আমি । একটু সময় হয়না তোর আমার সঙ্গে কথা বলবার?

- দুঃখিত আপু ! সত্যি আমার ভুল হয়ে গিয়েছে ।একটা জরুরী কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম । ঠিক আছে ; এ- কয়দিন রোজ তোমার সঙ্গে গল্প করবো ।বলে হেসে উঠলো স্বাতী ।

বুকের ভেতরটা কেমন মোচর দিয়ে উঠে বোনের হাসিমাখা মুখটা দেখে । কি নির্মল নিস্পাপ স্বাতীর হাসি !জ্যোতস্নার মত স্নিগ্ধ সে হাসি ! জড়িয়ে ধরে স্বাতীকে দুহাত দিয়ে বীথি ।

-কি এত জরুরী কাজ তোর ? কি চেহারা বানিয়েছিস ? আয় ;ঘরে গিয়ে বসি ।খেয়েছিস?

- না খাইনি ; চলো খেতে খেতে গল্প করি ।

বরাবরের মত টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছেন সালেহা বেগম ।

- খেতে বসলো স্বাতী ।একটা প্লেট নিয়ে বীথিও বসলো বোনের সঙ্গে খেতে ।

তোর পড়াশুনা কেমন চলছে ?

-পড়াশুনা ঠিকই আছে , তবে দেখছো না বছরের অর্ধেক সময়ই স্কুল -কলেজ বন্ধ থাকছে ?

-এভাবে আর কতদিন স্বাতী ?

-যতদিন না দেশ শত্রু মুক্ত হবে ,ততদিন এই অনিয়ম সহ্য করে নিতেই হবে আপু ।

-আমি এসব বুঝি কম । শোন স্বাতী ;তোর এখন যে বয়স আমার তার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তোকে নিয়েও

আমরা সবাই চিন্তায় আছি ।রাজী হয়ে যা । এই শেষ বয়সে আর বাবা -মাকে অশান্তিতে রাখিস না ।

- কে বলেছে তোমাকে আমাকে নিয়ে চিন্তায় আছেন বাবা-মা ?কোন চিন্তায় নেই ওরা ।আর বিয়ে ? আমি ? এখন ? প্রশ্নই উঠে না ।দেশ স্বাধীন না করে বিয়ে করছি না আমি । যদি এদেশ স্বাধীন না হয় কোনদিনও বিয়ে করবোনা । মাকে জানিয়ে দিয়েছি আমি। ।

- কি বলছিস তুই ? কিসের দেশ স্বাধীন ? তোর কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? আর তুই কি করবি দেশের ? যুদ্ধ করবি?

- হ্যাঁ । অবশ্যই করবো । দরকার হলে করবো না ? ঘরে বসে থাকবো ? যাক! এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই না । তুমি কেমন আছো আপু ?দুলাভাই কবে আসছেন ?

- কালই আসছে তোর দুলাভাই ।দুই সপ্তাহ থেকে আমাদের নিয়ে চলে যাবে ।শোন স্বাতী ; বিয়ে নাহয় পরেই করিস । একটা ছবি দেখতে তো তোর আপত্তি নাই ?

- ছবি ? কি সিনেমা আপু ? এত রাতে আবার কি সিনেমা দেখবো ?

- আরে দূর ! সেই সিনেমার কথা বলছি নাকি আমি ? একজনের ছবি , মানে ফটো ।দেখাই তোকে?

- কেনো ? ছবি দেখে আমি কি করবো ?

- কারণ তোর ছবি দেখে এই ছবির মানুষটির পাগল প্রায় অবস্থা ।এখন তুই একটু দেখে বল খালি তোর পছন্দ হয়েছে কি না ?বলে ইকবালের ক-একটা ছবি ধরিয়ে দিলো স্বাতীর হাতে । হাসতে হাসতেই উল্টে-পাল্টে ছবিগুলো দেখলো স্বাতী । তারপর বললো-

-ভদ্রলোক তো দারুন !পছন্দ না হওয়ার তো কোন কারনই দেখছিনা আপু। নিশ্চই তোমাদের ওখানে থাকেন ?

- হ্যা , তোর দুলাভাইয়ের বন্ধু । একই অফিসে কাজ করে ।

- কিন্তু আপু ,আমি তো এই দেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকছিনা । আর তোমার এই রাজপুত্রও আমেরিকার বিশুদ্ধ বাতাস , খাঁটি দুধ -ডিম ফেলে এই দূষিত আবহাওয়ায় এসে থাকবেনা। কাজেই তুমি অন্য রাস্তা মাপো ।এই ছেলের জন্য মেয়ের অভাব হবে না । মাকে বলো । মায়ের অনেক চেনা -জানা পরিবার আছে ।আমি তোমাকে সাহায্যও করতে পারবো না । কারন আমার কোন বান্ধবীই বিদেশে যেতে রাজী হবে না ।

-স্বাতী , প্লীজ ! একটু ভেবে দেখ ।এই দেশের কি সত্যি কোন আশা আছে ? এমন সৌভাগ্য পায়ে ঠেলছিস তুই?

- সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের সংজ্ঞা সবার কাছে সমান না আপু । তুমি আমাকে মাফ করো ।আমার খুব ঘুম পাচ্ছে আপু।

চলো শুয়ে পড়ি । অসম্ভব মন খারাপ নিয়ে শুতে গেলো সে রাতে বীথি আর তার পরদিনই পলাশ জানালো বীথিকে আশার কথা । পলাশ গিয়েছিলো অফিসের একটা কাজে চাটগাঁ ।সেদিনই খুব ভোরে ফিরেছে ।

পাঁচ

বীথি ,তোর সঙ্গে একটু কথা ছিলো আমার ।

-কি কথা ভাইয়া?

- জানিনা , কিভাবে বলি । তুইই বা কিভাবে নিবি ? চেয়েছিলাম স্বাতীর বিয়ের পরই নিজের কথা চিন্তা করবো কিন্তু এখন তো সে সম্ভাবনা দেখছি না । তোকেই মনে মনে খুঁজছিলাম কথাগুলো বলবার জন্য ...

- এত ভূমিকা করছো কেনো ?বলো না কি বলবে ?

- তুই তো আমার আর আশার ব্যপারটা জানিস বীথি ।

- ওমা! তোমরা এখনও যোগাযোগ রাখছো ? আমি তো ভেবেছিলাম অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে তোমাদের সম্পর্ক । আশার সঙ্গে তো এরমধ্যে দুইবার দেখাও হয়েছে । কই ওতো এরমধ্যে কিছুই বলেনি ।

- শেষ হয়ে যাবে কেনো ? কি বলছিস তুই ? আমি। বোধহয় মরেই যাবো আশাকে না পেলে, আর ও তোকে লজ্জায় বলতে পারেনি। এদিকে বাবা-মা তগাদা দিচ্ছেন মেয়ে দেখতে । অন্যদিকে আশার বাবা-মা উঠে -পড়ে লেগেছেন ওর বিয়ে দিতে । কথাটা যে কিভাবে উঠাই বুঝতে পারছিনা ।

- কেনো ? মাকে বলো নাই কেনো এতদিন ?

- কিন্তু বীথি বাবা-মা কি রাজী হবেন আশার পরিবারের পেছনের খবর জানলে ? ওর মা যে কাহিনী করে রেখেছে । আমি তো সাহসই পাচ্ছি না বাসায় ওর কথা উঠাতে । তবে মেয়েটা সত্যি দুঃখী রে ! তুই কিছু একটা কর বোন !

- সত্যি চিন্তায় ফেলে দিলে তুমি ভাইয়া । ঠিক আছে দেখি কি করতে পারি । তবে তুমি ভুল করোনি আশাকে ভালোবেসে । আশা সত্যি একটা লক্ষী মেয়ে । আমার মনে হয় আমি বাবাকে রাজী করাতে পারবো ।

সে রাতেই বীথি বসলো বাবার সঙ্গে । কয়েক মাস হলো মাত্র রহমান সাহেব রিটায়ার করেছেন । অফুরন্ত অবসর উনার হাতে। পলাশ বাবার জন্য তিনটা খবরের কাগজ ডেলিচারীর ব্যবস্থা করে দিয়েছে । তাছাড়া বেশ কয়েকটা মাসিক ম্যাগাজিন নিয়ে আসে এদিক সেদিক থেকে ।তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন রহমান সাহব । রিটায়ার করবার পর ধর্ম কর্মের দিকেও একটু বেশী ঝুকেছেন । বলতে গেলে পাঁচ বেলাই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন । ফাঁকে ফাঁকে যান আত্নীয়-স্বজনদের বাসায় ।

দুপুর থেকেই কেমন মেঘলা হওয়ায় সখ করে সালেহা বেগম ভূনা খিচুরী রন্নার আয়োজন করেন । রহমান সাহেব তাই শুনে বাজার থেকে নিয়ে আসেন একটা হাঁস ।তাই যত্ন করে রন্না করেন সালেহা বেগম। বিকেলে বীথির বর রবীন এসে পৌঁছেছে । রবীনের প্রিয় খাবারের তালিকায় হাঁসের মাংস একটি । আমেরিকাতে ঝামেলা করে এসব রান্না হয় কম । শ্বাশুরীর হাতে রান্না করা হাঁস আর খিচুরী দিয়ে খুব মজা করে রাতেরখাবার খায় রবীন । বীথি এর মধ্যেই পলাশ আর আশার কথা জানিয়েছিলো রবীনকে । বলেছে খাওয়া-দাওয়ার পর যেন পলাশকে নিয়ে একটু বাইরে চলে যায় রবীন । এই ফাঁকে বাবার সঙ্গে কথাটা উঠাবার ইচ্ছা ওর ।

খাওয়া দাওয়ার পর রান্নাঘরে মাকে সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করলো বীথি । সবকিছু সেরে এসে তিনজন বসলো বারান্দায় গল্প করতে । রাতে খাবার পর রহমান সাহেবের বহুদিনের অভ্যাস এককাপ লেবু চা খাবার । কিছুক্ষন চুপচাপ থাকবার পর সালেহা বেগমই কথা বললেন প্রথমে—

-কিরে ? স্বাতীর সঙ্গে কথা হলো তোর ? কি বললো স্বাতী ?

- না মা হবে না । তুমি তো স্বাতীকে চেনো ? ও দেশ ছেড়ে স্বর্গে যেতেও রাজীনা । আমেরিকা তো সেখানে ছার । দেখো ,তুমি যদি বোঝাতে পারো !

-আমি বোঝাবো স্বতীকে ?আমি কি ভাবে বোঝাবো বীথি ? তাছাড়া ও যদি দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে না চায় তা আমাদের এখানে কিছু করার নেই । বাদ দে এসব কথা । তোর নিজের কথা বল । ওখানকার গল্প কর ।

- বাদ দেবো কেনো মা ?জানো কত ভালো ছেলে ইকবাল ? আমেরিকাতে একটা ফার্মাসিস্টের রোজগার একজন ডাক্তারের পরেই । দেখতে-শুনতে তুলনা হয়না । নির্ঝঞ্ঝাট । তার মধ্যে সবচাইতে বড়কথা হলো নিজে যেচে বিয়ে করতে চাচ্ছে । এই যে দেখো ছেলের ছবি ! আমার সঙ্গেই আছে। কোন মেয়ে আছে এই ছেলেকে পছন্দ করবে না ? মানুষ পাগল হয়ে যায় বিদেশের কথা শুনলে ; আর তোমার এক মেয়ে মা! আবার দেখছি তোমারও এতে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আছে ! এদেশ কোনদিন স্বাধীন হবেনা মা মাঝখান থেকে পরে পস্তাবে তোমরা ।

- কি বলছিস তুই বীথি । কেনো স্বাধীন হবেনা ? এত শক্তিশালী বৃটিশ , তাদের কাছ থেকে ভারত ছিনিয়ে আনতে পরেনি ? নিশ্চই একদিন বাংলাদেশও তার আত্মপরিচয়ে পরিচিত হবার গৌরব অর্জন করতে পারবে। শোষণ করা সব সময় ক্ষনস্থায়ী হয় বীথি।

- বাব্বা ! মনে হচ্ছে স্বাতীর আগে তুমিই যুদ্ধে নেমে যাবে মা!

-দরকার হলে নামবোই তো ! ঘরে দা-বটি যা আছে তাতে আগে থাকতেই শান দিয়ে রাখতে হবে মনে হচ্ছে । বলে হসতে হাসতে পরিবেশটাকে হালকা করে তুললেন সালেহা বেগম ।

আচ্ছা । স্বাতীর কথা বাদই দিলাম । ওর যদি আইবুড়ো হবার ইচ্ছে থাকে আমার কিছু করার নেই । এখন যে কথা বলবো মন দিয়ে শুনো তোমরা । এটা তোমাদের আদরের ধন পলাশ সোনার কাহিনী , দেশের কন্যার সঙ্গেই মন দেয়া-নেয়া হয়েছে তোমাদের চান্দুর ।

- অসম্ভব কৌতুহলী হয়ে উঠলেন বীথির কথা শুনে সালেহা বেগম এবং রহমান সাহেব দুজনই ।

- পলাশ ? কি বলছিস তুই ? এর জন্যই সব সময় সিং মাছের মত খালি পিছলায় ছেলে আমার ! আজ পর্যন্ত একটা মেয়ে দেখাতে পারলাম না ওকে । মুখে তা বলে দিলেই তো হতো ! মেয়েটা কেরে ?ওরা বুঝি পড়তো এক সঙ্গে ? নাকি কাজ করে একসঙ্গে– ?

আরে না ! পড়তোও না ;কাজও করে না ।আর মেয়েটাকে তোমরা খুব ভালোভাবেই চেনো । আমার বান্ধবী আশা । ও আমার সঙ্গেই পড়তো । বিয়ের সময় অনেক খাটাখাটনি করেছে মেয়েটা । হলুদের প্রায় সব কিছুই ও সাজালো । তখনই ভাইয়ার সঙ্গে পরিচয় ।

- আরে ! দাড়া ! দাড়া !! মিষ্টি মত মেয়েটা না ? গানও তো গেয়েছিলো তোর হলুদে । অসাধারণ গানের গলা । দেখে তো মনে হয় খুবই লক্ষী মেয়ে । তা পলাশ এতদিন বলেনি কেনো ওর কথা ? তাছাড়া পরিচয় করিয়ে দিতেই বা দোষ ছিলো কি আমাদের সঙ্গে ?

-আছে ;অসুবিধা একটু আছে । ভাইয়াকে তো তোমরা জানোই । মুখচোরা । তারমধ্যে কিছু সমস্যা থাকাতে তোমাদের কাছে তা নিজে থেকে বলতে সাহস পাচ্ছিলো না । অপেক্ষায় ছিলো আমি কবে দেশে আসবো ?

- কি অসুবিধা ? সমস্যাই বা কি ?

অতঃপর .. বীথি বললো আশার পরিবারের সমস্ত কাহিনী । ওর মায়ের চলে যাওয়া থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থা সবই খুলে বললো বীথি ওর বাবা-মার কাছে। অবশেষে বললো-

- ছেলে-মেয়ের কারনে বাবা-মায়ের ছোট হয়ে থাকবার কথা , লজ্জা পাবার কথা শুনেছি । কিন্তু আশা ওর মায়ের কারনে নিজেকে এতটা ছোট মনে করে যে , ঠিক করেছিলো জীবনে বিয়েই করবে না । অনেক চেষ্টা করেছে ভাইয়াকে এড়িয়ে যেতে । কিন্তু ভাইয়া ছাড়েনি আশাকে । এখনও আশা বলছে ভাইয়াকে - -তোমার বাবা-মা রাজী না হলে তুমি মন খারাপ করো না। ওদের পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করে ফেলো । আমার কথা ভেবোনা , আমার একটা জীবন আমি একাই কাটিয়ে দিতে পারবো ।তবু বাবা-মায়ের দোয়া ছাড়া

বিয়ে করোনা ।মুরুব্বীদের দোয়া ছাড়া কারো জী বনে সুখ আসেনা ।

এতক্ষনে কথা বলে উঠলেন রহমান সাহেব ।

-বীথি । তুই পলাশকে বল ওর পছন্দকে আমি সাধুবাদ জানাই । এমন একটা দুঃখী মেয়ের পাশে যে ও দাড়াতে পেরেছে সেটাই ওর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব ।আর মেয়ের মা উল্টা-পাল্টা কাজ করেছে বলে কেনো মেয়েকে তার জন্য শাস্তি পেতে হবে ?তুই থাকতে থাকতেই আমি চাই পলাশের বিয়ের কথা-বার্তা হয়ে যাক । আর যদি সম্ভব হয় বিয়েটাও সেরে ফেলতে চাই

- সত্যি বাবা ? তুমি সত্যি বলছো ? তাহলে আমি একটা কাজ করিনা কেনো ? আমি আরো এক সপ্তাহ টিকেটটা পিছিয়ে দেই। তিন সপ্তাহ খারাপ সময় না ।আমি থাকতে থাকতেই বিয়েটা হয়ে যাকনা কেনো ?

- তাহলে তো আরো অনেক ভালো হয় বীথি । দেখ ! এই ব্যবস্থাই কর তাহলে সবাই মিলে ।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শেষের কথাগুলো শুনছিলো পলাশ আর রবীন দুজনেই । খুশীতে পলাশ রবীনের হাত চেপে ধরলো । ফিসফিস করে বললো ,এত সহজে হয়ে যাবে সবকিছু চাবতেও পারিনি রবিন !

- ওখানে দাঁড়িয়ে ফিসফিস না করে এদিকে আয় । আমি জানি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কেউ আমাদের কথা শুনছিলো।

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলো এবার পলাশ, সঙ্গে হাসতে হাসতে রবীন । বাবা-মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করলো পলাশ । বলল বাবা ,আমাকে দোয়া করবেন আপনারা । অবশ্যই দোয়া করছি অতি দ্রুতই অবশেষে বিয়ে কথাবার্তা হলো ; দিন তারিখ ঠিক হয়ে বেশ ধূমধামে সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেলো পলাশ আর আশার।

ছয়

বিয়ের তিনদিন পর ফিরে গেলো বীথি , রবীন আর ওর ছেলে অবীন সহ । স্বাতীকে ধরে অনেক কাঁদলো বীথি যাবার আগে ।বারবার রাজী করাতে চেষ্টা করলো ইকবালের জন্য । কিন্তু কোন কাজ হলো না। স্বাতীও অনেক মন খারাপ করলো । চোখ ভিজে উঠলো বোনকে বিদায় দিতে । কিন্তু ভেতরে ভেতরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যে আপুর সঙ্গে ওর বিদেশ যেতে হয়নি বলে । ভাগ্যিস বাবা-মা চেপে ধরেন নি । নয়তো স্বাতীর জন্য বিয়ে এড়ানো কঠিন হতো হয়তো ।

- আর তাহলে এ কাহিনীর এখনেই সমাপ্তি টানতে হতো । কিন্তু তাতো হবার নয় !!! এখনও যে আসল কাহিনী শুরুই হয়নি । তাই স্বাতীকে এই ছন্নছাড়া দেশটাতেই ফেলে রেখে ফিরে যেতে হয় বীথিকে আমেরিকা । ইকবাল নামের প্রতিষ্ঠিত , সুপুরুষ ,উচ্চাভিলাষী ছেলেটাকে বলতে হয় যে এই বিয়ে সম্ভব হচ্ছেনা ।ওর বোকা বোনটা ওর প্রিয় মাত্রিভূমি ছেড়ে কখনও বিদেশের মাটিতে ওর সুখের ঠিকানা রচনা করতে চায়না । এই ছোট্ট-দুঃখী দেশটায় তার থাকার আস্বাদ থেকে ও নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না ।

শুনে একটু অবাকই হলো ইকবাল । এখনও এমন মেয়ে আছে যে আমেরিকার মত আরাম আয়েশের জীবন উপেক্ষা করে দেশের ভাঙ্গা-চোরা জীবন বেছে নিতেও কুন্ঠাবোধ করেনা ? মনে মনে অদৃশ্য সালাম জানালো ইকবাল ওর না দেখা এক দেশ প্রেমিকা মহিয়সীর উদ্দেশ্যে । লোভ হলো নিজেও এমনি জীবন পাবার । ইচ্ছে হলো সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে ইকবাল নিজেও চলে যায়
ঐ ছোট্ট দুঃখী দেশটায় ।এক ধরনের নষ্টালজীতে পেয়ে বসলো ইকবালকে কয়েকদিনের জন্য । কিন্তু বাস্তবে ? হায়রে বিদেশ !!! একবার দি এর জালে কেউ আটকে পড়ে ; সে জাল থেকে নিজেকে ছুটিয়ে আনা বোধহয় সত্যি কঠিন ।এই মোহ মানুষকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেধে ফেলে । তাই ইকবালেরও আপাততঃ আশা হলোনা । আর স্বাতীরও যাওয়া হলোনা।

একদিন মিনু খালা এলেন বেড়াতে ওদের বাসায় । অবাক হয়ে গেলেন স্বাতিকে দেখে ।স্বাতীর মায়ের ছোটবেলার বান্ধবী মিনুখালা । প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দু-একদিন দুজনের দেখা হওয়া চাই ।মিনু খালারও খুব গল্পের বই পড়বার সখ ।তাই স্বাতীও খুব ভিরতো তার কাছে । গল্প পড়ে শোনাতেন, চুল বেধে দিতেন । স্বাতীর বয়স তখন নয় কি দশ । আর মিনু খালার ছেলে শাওনের বয়স তখন বারো কি তেরো ।মিনু খালা বলতেন–

-তুই বড় হলে স্বাতী , আমি তোকে শাওনের বৌ করে ঘরে নিয়ে আসবো ।

- স্বাতী খুব হাসতো একথা শুনে । আর কয়েক বছরের মধ্যেই স্বামীর একটা বিদেশী ফার্মে চাকুরী হওয়াতে দেশ-বিদেশ ঘুরতে থাকেন মিনু খালা । কয়েক বছর পর পর দেশে এসে তিন-চার মাস থেকে আবার অন্য কোন দেশে বদলী হয়ে যান । এবার প্রায় পাঁচ বছর পর দেশে ফিরলেন গত সপ্তাহে ।

একটু গুছিয়েই বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সবার জন্য প্রচুর উপহার নিয়ে । অনেক পরিবর্তন দেখলেন দেশে এসে । সবচাইতে অবাক হলেন স্বাতীকে দেখে ।

-কিরে কেমন আছিস স্বাতী?

- ও ,মিনু খালা ? ভালো আছি । তুমি কবে এলে ?

-কেনো সালেহা বলেনি তোকে ?আমি তো গত সপ্তাহেই ফিরেছি । সবার সঙ্গে কথাও হয়েছে ফোনে । শুধূ তোকেই একবারও পাইনি ।

- ও ! বোধহয় ব্যস্ত ছিলাম ।

-এত কি ব্যস্ততা তোর" মেয়েছেলে "হয়ে ? ইউনিভার্সিটি ছাড়া তোর আর কি ব্যস্ততা থাকতে পারে ? তাছাড়া এখন তো ক্লাসও প্রায় বন্ধ শুনলাম । দেশের অবস্থাও তেমন ভালোনা । আর কি ছিরি করে রেখেছিস নিজের ? আয়নায় নিজেকে দেখিস না ?

-হঠাত যেন জ্বলে উঠলো স্বাতীর ভেতরটা ।" মেয়েছেলে "কথাটা বুকের ভেতর তীরের মত বিঁধলো ।কিন্তু সামলে নিলো

-এই তো পরীক্ষার জন্য নোট-টোট নিয়ে ব্যস্ত থাকি । সময় পাই না ।

- স্বাতী , তুই ছোট থাকতেও সুন্দর ছিলি । কিন্তু এত সুন্দর হবি ভাবিনি ।বহুদিন পর দেখলাম তোকে । কি সুন্দর হয়েছিস তুই ! চিড়ুনিটা নিয়ে আয় । চুলটাও ঠিক করে দেই ।আর এই ব্যগটা নিয়ে যা । ,বিকেলে হয়তো শাওন আসবে ;দেখা করিস ওর সঙ্গে ।

হেসে দিলো স্বাতী ছোটবেলার মতই । জানে এই ব্যগের কোন কিছুই ও ব্যবহার করবে না ।তবু ব্যগটা উঠিয়ে নিলো হাতে । ধন্যবাদ খালা ।আজ থাক । আমি খুব ক্লান্ত ।এখন একটু ঘুমাবো আর একদিন সাজিয়ে দিও । বলে নিজের ঘরে ঢুকে আস্তে করে বন্ধ করে দিলো দরজাটা ।

বেশ অবাক হলেন মিনু খালা । এই বয়সে মেয়েরা কেমন সাজতে পছন্দ করে , আর স্বাতীটা যেন কেমন হয়েছে !

বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করেন মিনু । দুই বান্ধবী কোনদিনই লুকায় নাই কোন কিছু একে অপরের কাছে । কিন্তু অনেকদিন পর দেশে ফিরবার পর টের পেলেন মিনু খালার মানসিকতা অনেক বদলে গিয়েছে ।অনেক কিছু লুকিয়ে শুধু আভাস দিলেন সালেহা বেগম স্বাতীর ইদানীংকার কার্যকলাপ সম্বন্ধে । তাতেই যেন জ্বলে উঠলো মিনু –

- তুমি ওকে বাধা দাওনা কেনো সালেহা ? এটা অসম্ভব !!! স্বপ্ন দেখছে ওরা । কোন দিনও পাকিস্তানীদের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব না ।

চুপ করে থাকেন সালেহা বেগম । মনে মনে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকেন ।

- কথা বলছো না কেনো তুমি সালেহা ? ওকে তোমরা থামাও ।এটা শুধু একটা বয়সের খেলা ! কোন রাজনৈতিক নেতা ওর ব্রেইন ওয়াশ করছে ।এগুলো বেশীদিন থাকবেনা । এক সময় নাতী-নাতনীদের কাছে গল্প করবে কিভাবে মশাল-মিছিল নিয়ে চিৎকার করেছে একদিন । কিন্তু এখন দেশের যে অবস্থা ! এসব খেলা মরন- খেলা ছাড়া আর কিছুই না ।

সালেহার কানে মিনুর অনেক কথাই পৌছালো না । আপন মনে চাল বাছতে বাছতে সেদিনের দেখা স্বপ্নটা আবার মনে পড়ে যায় । তাকেও যেন স্বাতীর মতই ঘোরে পেয়েছে ।মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন দেশ খুব শিঘ্রী স্বাধীনতার মুখ দেখবে ।গোলামীর শিকল খুলে যাবে পা থেকে । একসময় মিনু বিদায় নেয় বান্ধবীকে একগাদা উপদেশ দিয়ে । মিনু চলে যাবার পর আস্তে আস্তে টোকা দেন সালেহা বেগম স্বাতীর দরজায়।

- এসো মা । আমি জানতাম তুমি আসবে ।

মা অবাক হলেন স্বাতীর কথা শুনে ।

- সেদিন কি তুমি আমার খাতাটা পড়ে পুরো শেষ করেছিলে ? না করে থাকলে আজ নিয়ে যাও । যেখনে বোঝনা , আমাকে জিজ্ঞেস করো । আমি বুঝিয়ে দেবো । চমকে উঠেন সালেহা বেগম ।

- তুই কিভাবে জানলি ? তুই তো অঘোরে ঘুমাচ্ছিলি তখন !

- মা!!! আমরা ঘুমাই না । আমরা ঘুমিয়ে গেলে কিভাবে দেশকে জাগাবো ? ঘুমের মধ্যেও একটা ইন্দ্রীয় সজাগ রাখতে হয় আমাদের । এটাই আমাদের নিয়ম । আর খতাটা ? আমি ইচ্ছে করেই তোমার জন্য সেদিন টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিলাম । সেটা একটা অতি গোপনীয় খাতা। এভাবে যেখানে-সেখানে রেখে দেয়ার মত কোন কারনই নেই সেটাকে । আমার মন বলছিলো তুমি আসবে সে রাতে ।

মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে ।

- ভাত খাবি ? সেদিনের মত মেখে নিয়ে আসি ? মুখটা কেমন শুকিয়ে আছে । সারাদিন কিছু খাসনি মনে হয়?

জড়িয়ে ধরে স্বাতী মায়ের গলা ।

- মা , তুমি কত ভালো! আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাও না মা ? সেই যে ছোটবেলার মত গুন গুন করে গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে ? তেমনি আমাকে আজ ঘুম পাড়িয়ে দাও । দেখবে। সত্যি আমি ঘুমিয়ে যাবো । অনেক দিন ভালো করে ঘুমোই নি মা !সামনে আমাদের অনেক কাজ ! একটু বিশ্রাম দরকার । তোমাকে ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগবে মা !

থ হয়ে যান মেয়ের কথা শুনে সালেহা বেগম ।

- কোথায় আবার যাবি তুই ?

- যেতে হবে মা।খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শুরু হবে। তখন সবাই যদি ঘরে বসে থাকি কে যুদ্ধ করবে?

-ভাত মেখে নিয়ে আসেন মা । স্বাতী খেতে খেতে আজও অনেক গল্প করে । এমনিভাবে প্রায় রাতেই মেয়ের সঙ্গে গল্প হয় মায়ের । যেন কি এক নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে । একদিন বলেই ফেলেন সালেহা বেগম–

- আমাকেও নিয়ে যানা তোর সঙ্গে তুই যেখানে যাস!

- নিয়ে যাবো একদিন । তোমাকে সব দেখিয়ে আনবো । বয়স কোন ব্যপার না মা বুঝলে ? দেশের জন্য হতে পারে একদিন সবাইকেই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে । এটা

তোমাকে জানিয়ে রাখলাম মনে মনে তৈরী থেকো ।

- কিন্তু সে সুযোগ আর হলোনা সালেহা বেগমের । ২৫ মার্চের কালো রাত্রি সবকিছু ওলট-পালট করে দিলো । সমস্ত রাত্রি পুরানা পল্টনের বাসায় বসে গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কের রাত্রি কাটিয়ে দেয় সবার মত স্বাতীদের বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ । ছেলে তখন বিয়ে করে মাস ছয়েক আগে ঘরে বৌ তুলেছে ।কোন দলাদলির মধ্যে নাই পলাশ । নিতান্তই শান্তিপ্রিয় মানুষ তার বাবার মত । মাঝে মাঝে স্বাতীর ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে কথা বলে ; এ ব্যাপারে তেমন চিন্তিত ছিলোনা । ভেবেছে দু এক বছর পর ঠিক হয়ে যাবে আর সবার মতই । বাংলাদেশের রাজনীতির চেহারা বদলায় ক্ষনে ক্ষনে । কে যে আসল আর কে নকল সেটা বোঝা ভার । সেটা বুঝতে পারলেই পার্টি ছেড়ে চলে আসবে । কিন্তু আজ সবাই চিন্তিত হয়ে বসে আছে বসবার ঘরে । কাল রাতে বাড়ী ফারেনি স্বাতী ।কোন ফোনও করেনি ।ধরেই নিয়েছে বড় কোন বিপদে পড়েছে স্বাতী ।

কিন্তু সালেহা বেগমের মন তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না । এত জলদি যে স্বাতীর কথা সত্যি হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি । পরের দুদিনও দেখা নেই স্বাতীর ।

তৃতীয় রাতে আস্তে আস্তে টোকা পড়লো দরজায় । তখন রাত প্রায় বারোটা । সবাই ঘুমে অচেতন ।শুধু ঘুম নেই মায়ের চোখে। প্রতিটা শব্দই কান পেতে শুনেন ।এই বুঝি এলো মেয়েটা । বাতাসের শব্দও যেন সচকিত করে দিয়ে যায় এই নিঝুম শহরটাকে । বিশ্বাস ছিলো স্বাতী মার সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই যাবেনা ।

দ্বিতীয়বার দরজায় টোকা দেবার আগেই দরজা খুলে দেন সালেহা বেগম ।

মা ,তোমার সঙ্গে শুধু দেখা করতে এলাম । ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে হলো এ- দুদিন। যত তাড়াতাড়ি পারো তোমরা দেশের বাড়িতে চলে যাও ।যতদিন দেশের অবস্থা স্বাভাবিক না হয় ফিরে এসো না ।

- তুই কোথায় যাচ্ছিস ?তুইও চলনা আমাদের সঙ্গে। - বোকার মত কথা বলো না মা । তুমি সবই জানো । এখনই সময় ঝাপিয়ে পড়বার । আর দেরী করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে

-কই যাবি তুই ? আমাকেও নিয়ে যা সঙ্গে করে ।

- এখনও সময় হয়নি মা । যদি কোনদিন সময় হয় ; আবশ্যই তোমাকে নিতে আসবো । আমি আর দেরী করতে পারছিনা । ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে । ময়ের পা ছুঁয়ে সালাম করলো স্বাতী । আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে সালেহা বেগম । জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে বুকের মধ্যে । বাঁধভাঙ্গা জলের মতই এবার কেঁদে ব্যকুল হয়ে গেলেন মা । বুকের ভেতরটা চুরমার হয়ে গেলেও বুঝতে দিলো না স্বাতী , শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো মাকে ধরে । একবিন্দু পানি আসতে দিলোনা চোখে ।

-আমাকে না বলেই চলে যাচ্ছিস মা স্বাতী ?

কখন বিছানা ছেড়ে নি;স্বব্দে উঠে এসেছেন রহমান সাহেব দুজনের কেউই টের পায়নি । থমকে গেলো দুজনই । ঘুরে দাড়ালো স্বাতী বাবার দিকে ।

জানি তোর হাতে সময় নেই ।এদিকে আয় মা । তোকে একটু আদর করে দেই । এত দূরে দূরে থাকিস কেন ? দেশকে কি শুধু তুইই ভালোবাসিস ? আমি কি এ দেশের সন্তান না ?

বলে মায়ের মতই জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে রহমান সাহেব। এবার স্বাতীও নিজেকে সামলাতে পারলোনা । ফুঁপিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিলো বাবার পরনের সার্ট।

- কোথায় যাচ্ছিস বলে যা অন্তত !

- আপাততঃ ইন্ডিয়ার ওখানেই আমাদের ঘাঁটি হবে । সেখান থেকে আস্তে আস্তে সবাই ছড়িয়ে পরবো । তোমরা কোন চিন্তা করোনা ।দেখবে এবার দেশ স্বাধীন হবেই । আর যদি ফিরে না আসি ; দুঃখ করো না । কিছু মানুষকে তো দেশের জন্য প্রান দিতেই হবে ।তার মধ্যে নয়তো আমি হবো একজন ! আর অনেকে ফিরে আসবে গাজি হয়ে । রক্তের হলি খেলা হবে এবার দেখে নিও তোমরা । জুঁই ফুলের রঙ যদি সাদা না হয়ে লাল হয়ে যায় একটুও অবাক হয়োনা। বাংলার মাটি রাঙিয়ে দেবো এবার শক্রর রক্তে ।

চলে গেল স্বাতী। বেশ কিছুক্ষন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন দুজন । এরপর আস্তে আস্তে ফিরে গেলেন দেশের বাড়িতে যাবার প্রস্তিতি নিতে । দরকারী জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ।

সাত

স্বাতীদের ২৫জনের দলটা সে রাতেই রওয়ানা হলো । প্রথমে বাসে করে কুমিল্লা ।তারপর নৌকায় আগরতলার বর্ডারে ।

অবাক হয়ে গেলো স্বাতী সেখানকার জনসমাগম দেখে । জানতো অনেকেই ভেতরে ভেতরে তৈরী হচ্ছিলো । কিন্তু এত মানুষ দেখতে পাবে আশা করেনি ।খুশীতে ভরে উঠলো মনটা। অনেক সাহস পেলো মনে । আত্নবিশ্বাস আরো জোড়ালো হলো । তবে মেয়েদের সংখ্যা নিতান্তই কম । কমান্ডাররা ভাগ করে নিলেন এক একটা দল । মোটামুটি ট্রেনিং ছিলো ওদের অস্ত্র চালনায় ।কিন্তু আরো এক সপ্তাহ ঝালাই করে নিলো সবাই স্টেনগান চালানো আর দাঁত দিয়ে পিন কেটে দ্রুত গ্রেনেট ছোড়া যায় কিভাবে?

তারপর চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো ওরা ।গ্রামে- গঞ্জে , আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লো নানান ছদ্মবেশে । কারো

দায়িত্ব হলো শুধূ খবর এনে দেয়া, কোথায় পাকিস্তানীরা ঘাঁটি বেঁধেছে । কেউ কেউ রাজাকারের অভিনয়ে মিশে গেলো বিপক্ষ দলের সঙ্গে । বাকীরা সরাসরি যুদ্ধে নেমে গেলো অস্ত্র হাতে নিয়ে ।

কমান্ডার রাজীবের অধীনে কাজ করছে স্বাতীদের পনেরো জনের দলটি । স্বাতীর মত মেয়েও কথা বলতে ভয় পায় রাজীব ভাইয়ের সামনে গেলে । কি প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব লোকটার গলার শব্দ নয় যেন মেঘ গর্জন ।চেহারা যেন পাথরে করা। কোন দিন কেউ হাসতে দেখেনি তাকে ।কাজ ছাড়া কিছুই বোঝেনা সে ।

হালকা-পাতলা স্বাতী শাড়ী ছেড়ে শার্ট প্যান্ট পরছে আজকাল । বিশেষ করে যখন মিশনে বের হয় । স্বাতীদের নৌকাটা যাচ্ছিলো কুমিল্লার কাছাকাছি । জেলেদের নৌকা । একেবারেই সাধারন জেলের বেশে মাছ ধরছিলো স্বাতীরা । নৌকায় ওরা পাঁচজন তখন । নৌকা থামালো খান-সেনাদের লঞ্চ । আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিলো, কারন সেই লঞ্চে ছিলো ওদেরই লোক আসলাম ভাই ।

তিনজন খানসেনা নেমে এলো নৌকায় ।স্বাতীর দিকে এগিয়ে এসে একজন বললো -

- আওরাত কি তারা খুবসুরত হো তোম । কেয়া নাম হায় তোমহারা ?

- আমার নাম ? আমার নাম হলো স্বাতী । আজরাইলের খালাতো বোন । বলে ঢোলা ফতুয়ার ভেতর থেকে স্টেনগান বের করে তিনজনকেই শেষ করে দিলো ওরা কিছু বুঝবার আগেই । এরমধ্যে গ্রেনেট ছুড়েছে চারজন চারটা লঞ্চ লক্ষ করে পাটাতনে । দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো লঞ্চে । কারন আসলাম ভাই আগে থেকেই লঞ্চের জায়গায় জায়গায় কেরোসিন তেল ঢেলে রেখেগেছিলো ।কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো পনেরো জন খানসেনা । পানির নীচে তলিয়ে গেলো চোখের সামনে গোটা লঞ্চটা। তার সাথে শহীদ হলেন ওদের অতি প্রিয় আসলাম ভাই । একমাত্র ছেলেকে মুক্তি বাহিনীতে পাঠিয়ে পঞ্চাশ বছর বয়সে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অস্ত্র হাতে দেশকে মুক্ত করতে । নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে প্রমান রেখে গেলেন দেশ প্রেমের।

বেশ কিছুক্ষন লাগলো ওদের এ ধাক্কাটা সাম্লে নিতে । স্বাতীই প্রথম যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো । তখনও রক্তের দাগ শুকিয়ে যায়নি নৌকার পাটাতন থেকে । কয়েক মগ পানি দিয়ে ধুয়ে দিলো প্রথম পাটাতনটা । তারপর নির্বিকার চিত্তে খুলে বসলো মুড়ি আর গুড়ের টিনটা । একমুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো আবহাওয়া নীরিক্ষনে , যেন কিছুই হয়নি এভাবে । অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো রাজীব স্বাতীর কান্ড দেখে । নির্বিকার ভাবে মুড়ি খেয়ে যাচ্ছে স্বাতী। চোখ ফারাতে পারছেনা রাজীব কবিতার মত অপূর্ব লাগছে দৃশ্যটা , জীবনে এই প্রথম কোন মেয়েকে ভালো করে নীরিক্ষণ করছে রাজীব আহমেদ। এই প্রথম হাসতে দেখলো সবাই কমান্ডার রাজীবকে ।

-তুমি সত্যি অসাধারন স্বাতী ! বলে মুড়ির টিন থেকে নিজেও একমুঠো মুড়ি নিয়ে মুখে দিলো সঙ্গে একটুকরো পাটালী গুড় । ছোট্ট এই ঘটনাটা বদলে দিলো রাজীবের চরিত্র ।সবার সঙ্গে এরপর থেকে অনেকটা স্যভাবিক হয়ে এলো ও ।মাঝে মাঝে ছোটখাটো হাসি-তামাসাতেও যোগ দিলো । কিন্তু কারোরই দৃষ্টি এড়ালো না স্বতীর দিকে যেন একটু বেশী মনোযোগ আজকাল রাজীবের । তবে কাজ ওদের একবিন্দু থেমে থাকলো না।

আজকাল রাজীবের দলটা যেখনেই যাক স্বাতীও থাকছে সেখানে । আর প্রতিবারই কোন না কোন অদ্ভুত কাজ করছে স্বাতী ।

আর একদিনের ঘটনা । ক্ষেতে ধান বুনবার কাজ করছিলো সবাই । একেবারে কাদা-পানিতে মাখামাখি । স্বাতী সেদিন পরেছে একটা লাল-নীল ডুড়ে শাড়ী । টের পেলো সবাই দুজন খানসেনা এগিয়ে আসছে । লোভীর মত তাকাচ্ছে স্বাতীর দিকে ওদের নেতা । মিষ্টি করে হাসলো স্বাতী দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে । তারপর হাটতে থাকলো পাটক্ষেতের দিকে ইশারা করে । সম্মোহিতের মত অনুসরন করলো স্বাতীকে । নির্বিকার ভাবেহেঁটে যাচ্ছে স্বাতী । পাটক্ষেতে ঢুকে গেলো দুজন । বেশ কিছুক্ষন কোন শব্দ নেই ।এরমধ্যে শেষ করে দিয়েছে ওরা আর একজনকে । একটা ঝোপ যেন নড়ে উঠলো অথচ কোন গুলির শব্দ নেই । ভয় পেয়ে এগিয়ে গেলো রাজীব । এমনি সময় বেড়িয়ে এলো স্বাতী ধান কাটবার একটা ধারালো কাঁচি হতে । টপ টপ করে রক্ত ঝরছে সেটা থেকে ।মুখে অনাবিল হাসি । ছুটে গেলো রাজীব - তোমার কিছু হয়নি তো ? ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাকে তুমি । উহ !

আশচর্য হয়ে গেলো সবাই রাজীবের এই নূতন রূপ দেখে । কারোরই দৃষ্টি এড়ালোনা ব্যাপারটা । রাতে ক্যাম্পে এসে বেশ কয়েকবার এই নিয়ে ঠাট্টা করলো সবাই নানাভাবে ।

- স্বাতী , তুমি ঠিক আছোতো ? কোন ক্ষতি করেনি তো ওরা ? মেয়ে বটে তুমি একটা!তুমি তো দেখছি পাথর থেকে পানি বের করলে শেষ পর্যন্ত ।

একটুও রাগ করলো না স্বাতী । সবার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিলো । বুঝিয়ে দিলো স্বাতীরও ভালো লাগে রাজীবকে । রাজীবের মত সঙ্গী পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যপার ।

এক সময় দুজনই টের পেলো এই ধ্বংশের মধ্যেও কখন ওরা একে অপরের অনেক কাছে চলে এসেছে । কিন্তু একি সর্বনাশের খেলায় মেতেছে ওরা ?যেখনে জীবনের কোন

নিশ্চয়তা নেই ; প্রতিটা মুহুর্তে জান বাজী রেখে যুদ্ধ করছে তারা , সেখানে এই ভালোবাসাবাসি কতদিন জিইয়ে রাখা যাবে ? কিন্তু মানুষের মন যে এক অদ্ভুত পদার্থ দিয়ে বানানো । এরমধ্যে কোন সময় , কাল , জাত , পরিবেশ কোন যুক্তিই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনা।

তাই তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। একের দুঃখে চোখ ভিজে উঠে সুখে হয় সুখী।

তেমনি রাজীব আর স্বাতী জেনে শুনেও শেষ কদিনের জন্য হলেও ভালোবাসার স্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চাইলো না। যুদ্ধ করে এসে আজকাল মাঝে মাঝে মাঠের এক প্রান্তে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে ওরা । গল্প করে কাটিয়ে দেয় বেশ কিছুটা সময়।

অনেক গল্প করতো ওরা সে সময় । বেশীর ভাগই ওদের নিজেদের কথা । বাবা -মা ভাই বোন সবার কথা । স্বাতী বলে ওর মায়ের গল্প ।শুনতে শুনতে কেমন আনমোনা হয়ে যায় রাজীব । স্বাতীর গল্প শুনে দুই হাটুর মাঝখানে মুখ লুকায় রাজীব । দশ আঙ্গুলে খামচে ধরে চুল । তারপর স্বাতীকে শুনায় ওর নিজের কাহিনী।

আট

ছোট্ট একটি গ্রাম । নাম " নয়নপুর " । সত্যি নয়ন কাড়া একটি গ্রাম । ঢাকার সদর ঘাট থেকে নৌকায় উঠলে মাত্র দেরঘন্টা লাগে সেখানে পৌছাতে । বাস অথবা ট্রেনের কোন দরকার হয় না । পাঁচ বছরের ছোট্ট রাজীব । সারা গ্রামে ঘুরে বেড়ায় । খেলে বড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে । বাবা -মায়ের নয়নের মনি । প্রতি রাতে ঘুম পড়ানিয়া গান না গাইলে ঘুম আসেনা রাজীবের ।মা চুলে বিলি এটে কেটে গান গায় -

- আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা ,

আমার রজূর কপালে টিপ দিয়ে যা।

রাজীবের কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ভালো গানের গলা ওর মায়ের । সব চাইতে ভালো রান্না করে ওর মা । মা যখন গোসল করে চুল ছেড়ে উঠানে বসে চাল বাছতো ,মায়ের ঘন চুলের নীচে লুকাতো ওর ছোট্ট মূখ । গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে আদর করতো । মা যতটা না আদর করে রজীবকে , রজীব যেন তার চাইতে আরো অনেক বেশী আদরে আহ্লাদে ভরিয়ে দিতে চায় মাকে ।

একদিন মেলায় গেলো বাবার সঙ্গে । বাবা বললেন -

- কি নিবা বাপ ? তাড়াতাড়ি নেও । আমার আবার সদরে যাইতে হইবো একটা জরুরী কামে ।

নানান রকমের খেলনা ঝুলছে । বাঁশের বাঁশী, রঙীন বল , ডাংগুলি কিছুই নিচ্ছে না রাজীব । হঠাত খুশীতে উজ্জল হয়ে উঠে ওর চোখমুখ । যেনো সাতরাজার ধন খুজে পেয়েছে । - বাবা আমি এইটা নিমু ।

এইটা তো মেয়েলোকের পায়ে পড়বার জিনিস ।

তুই এইটা দিয়া কি করবি?

- মায়ের পায়ে পড়ায় দিমু । সখিনা খালারে দেখছি এমুন মল পইরা হাটতে ।হাটবার সময় ঝুম ঝুম কইরা শব্দ হয় । মায়ের পায়ে পরলে তেমনি শব্দ হইবো ।বাড়ীর যেইখানেই আমি থাকিনা মা হাটলে বমু মা কোনখানে আছে ? মনে হইবো সব সময় মা আমার কাছাকাছি আছে ।

- তুই তর মায়েরে এত কেন ভালোবাসস রাজীব ?

- আমার মা যে পৃথিবীর মইধ্যে সবচাইতে সুন্দর বাবা ! কারোর মা আমার মায়ের মত না ।

একহাতে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে আরো কাছে নিয়ে আসে শাহ আলম ।

বাসায় এসে ছুটে যায় রাজীব মায়ের ঘরে । বলে -

- মা , চোখ বন্ধ করো । খুলবানা কিন্তু !আমি না কওয়া পর্যন্ত !

মা চোখ বন্ধ করে বলেন -

- এমুন কি রহস্য যে চোখ বন্ধ করতে হইবো?

- আরে করোই না ! পোলা যখন কইছে ?

মা চোখ বন্ধ করলে নিজের হাতে পরিয়ে দেয় রাজূ সেই মল মায়ের পায়ে ।

- এইবার চোখ খুলো মা । তারপরে হাটো ।

- হায় আল্লা ! এইটা কি করছস রাজূ ? এইটা পরবার বয়স কি আমার আছে ? এই জিনিস পরবো পোলাপানেরা । বলে লজ্জায় লাল হয়ে যায় রাজুর মা মরিয়ম বানু । খোল এইটা পায়ের থিকা । পাড়ার মানুষ দেখলে কি কইবো ?

- কি কইবো আবার ? দেখো মা ! তোমার পায়ে কি সুন্দর মানাইছে এইটা ! বলে উপুর হয়ে দুই ঠোট লাগিয়ে চুমা দেয় রাজীব মায়ের পায়ে । আমার মায়ের পা হইলো পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সুন্দর!!!

দুই হাত তুলে বুকে তুলে নেয় শিশু রাজীবকে মা । আবেগে চোখ ভিজে যায় মরিয়মের । মা ছেলের কান্ড দেখে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠে শাহ আলম ।

- তুই আমারে এত কেন ভালোবাসস বাপ ?

- কারন তুমি যে আমার মা !!!

- বড় হইলেও এমনি ভালোবাসবি তো মানিক ?

- অবশ্যই বাসমু মা । বাবা যখন বুড়া হইয়া মইরা যাইবো , তখন আমি তোমারে বিয়া করমু ।

হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরেন মা । ছেলের মুখ চেপে ধরেন এক হাতে ।

- ছিঃ! বাবা! এমুন কথা কইতে নাই । মায়েরে কি কেউ বিয়া করে ? মায়েরে বিয়া করতে নাই । আমি তরে আরো অনেক সুন্দর বৌ আইন্যা দিমু ।

- ঠিক তোমার মত তো ? তোমার মত না হইলে কিন্তু আমি বিয়া করমু না !

হাসতে হাসতে বলেন মা - - হ , ঠিক আমার মতই দিমু যা। আয় অখন খাইতে আয় ।

নিজের হাতে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে খাইয়ে দেন মা।

- মা তোমার ভাত হইলো দুনিয়াতে সব চাইতে মজার ভাত।

- এমুন পাগল পোলাও কারো আছে ?

নানা চিকিৎসা, পানি পড়া , তাবিজ, কবজ দিয়েও আর কোন সন্তান ঘরে আনতে পারেনি শাহ আলম আর মরিয়ম । মাঝে মাঝে আফসোস করে ওরা । তারপর নিজেরাই বলে -

- এমুন সোনার পোলা আমাগো একলাই একশো । আল্লা বাচায় রাখলে আমাগো রাজীবই বাপ-মায়ের লাঠি হইবো বুড়া কালে ।

স্কুলে যাওয়া শুরু করলো রাজীব । অসম্ভব মেধাবী ছাত্র হিসাবে কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত স্কুলে পরিচিত হয়ে গেলো রাজীব আহমেদ ।

দশ বছর বয়সে ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে এলো রাজীব ।

- মা , আমি সবগুলি প্রশ্নেরই উত্তর ঠিকমত দিতে পারছি । আমি জানি আমি একশোতে একশো পামু মা ।

ঠিকঐ নি বাপ ? বলে দুহাতে জড়িয়ে ধরেন ছেলেকে মা । কপালে চুমা দিয়ে বলেন -

- অবশ্যই তুই একশোতে একশো পাবি ।

কেমন দুর্বল শুনা যায় মায়ের গলা ।

- মা তোমার শরীরটা এত গরম কেন ? তোমার তো জ্বর মা !

- হ বাজান ; শরীরটা তেমন সুবিধার মনে হইতাছে না কয়দিন ধইরা ।বলে খুশ খুশ করে কেশে উঠেন মরিয়ম ।

সেই থেকে শুরু । প্রায়ই জ্বর হয় মরিয়মের। খুশ খুশ করে কাশে । আদা-মধূ দিয়ে চা বানিয়ে মায়ের মাথার কাছে নিয়ে আসে রাজীব । নিজের হাতে সামনে বসে খাওয়ায় মাকে । গ্রামের ডাক্তার আসে । ঔষধ দিয়ে যায় । কোন কাজ হয়না । শহরের বড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মরিয়মকে । সমস্ত কিছু টেস্ট করে ধরা পরে মরনব্যধিক্যান্সার । সমস্ত দুনিয়া যেন অন্ধকার হয়ে আসে রাজীবের বাবা শাহ আলমের । নিজের জন্য যতটা না । তার চাইতে বেশী চিন্তা করে ছেলেকে নিয়ে । ছেলের বয়স এখন বারো ।অসম্ভব বুদ্ধিমান ছেলে তার । মফস্বল স্কুলে পড়লেও প্রচুর জ্ঞান রাখে ।কিভাবে ছেলেকে খবরটা দেবেন সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে যায় শাহ আলম ।

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মরিয়মও কেঁদে বালিশ ভিজায় । নিজের চাইতে ছেলের কথা ভেবে বুকের পাজর যেনো একটা একটা করে ভাংতে থাকে প্রচন্ড যন্ত্রনায় । মা অন্তঃ প্রান ছেলে । হায়রে !!! কে দেখবে তার সোনামনি রাজীবকে ? পৃথিবিতে যে আর কেউ নেই রাজীবের মায়ের মত ! কে সামনে বসে ভাত মুখে তুলে খাওয়াবে ওর মানিককে ? কে দেখাশুনা করবে ? সৎমা ? ভাবতেও গায়ে কাঁপুনী দিয়ে উঠে মরিয়মের । ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে । বেশী হলে আর তিন মাস সময় আছে মরিয়মের হাতে । তাও হাসপাতালের তত্যাবধানে থাকলে ।বাড়ীতে চলে গেলে মেয়াদ হয়ে যাবে আধা । তবু একরকম জোর করেই মরিয়ম বাড়ীতে চলে আসে । জীবনের শেষ কয়টা দিন চায় ও ছেলের কাছাকাছি থাকতে । তাই সপ্তাহ তিনেক হাসপাতালে কাটাবার পর ফিরে আসে মরিয়ম আবার আপন ঠিকানায় ।

নয়

ফাইনাল পরীক্ষা চলছিলো বলে রাজীবকে বাড়ীতেই রাখা হয়েছিলো । মা ফিরে আসবার খবর শুনে সমস্ত বাড়ী ধূয়ে মুছে পরিস্কার করে রাজীব নসিরন বুয়াকে নিয়ে । বিছানার চাদর , বালিশের কভার , এমন কি কাথাগুলো পর্যন্ত ধূয়ে শুকিয়ে ঝর-ঝরে করে রাখে মায়ের জন্য । বাজার থেকে কাঁচা পেপে আর শিং মাছ এনে দেয় বুয়ার কাছে । স্বাস্থ-শিক্ষা ক্লাসে শিক্ষকের কাছে জেনেছে এ সমস্তই নাকি অসুস্থ মানুষে শরীরে বল বাড়াতে সাহায্য করে । সবকিছু তৈরী । এখন শুধূ মায়ের অপেক্ষা ।

আগে থাকতেই নদীর ঘাটে গিয়ে বসে থাকে মায়ের নৌকা কখন আসবে ? দূর থেকেই চিনতে পারে নৌকার বাইরে সাদা পাঞ্জাবী গায়ে ছৈএর গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছেন বাবা । ঐ তো আসছে ওর মা । খুশী যেনো আর ধরেনা রাজীবের । জন্মের পর থেকে একবারও এতদিন মাকে ফেলে থাকতে হয়নি । মায়ের চিন্তায় পরীক্ষা খুব একটা ভালো হয়নি । তাতে কি ? এর পরের বার ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দেবে । নৌকা এসে ঘাটে ভিরলো । ছুটে গেলো রাজীব মাকে এগিয়ে আনতে । কিন্তু একি ? এ কে ? এ তো ওর মা না ! এ তো ওর মায়ের কঙ্কাল ।হাড় সর্বস্ব ফ্যাকাসে একটা মূর্তি শাহ আলমের কাঁধে ভর করে আস্তে আস্তে নেমে আসে নৌকা থেকে । অসম্ভব ক্লান্ত একটি চেহারা , কিন্তু ছেলেকে দেখে রজ্যের খুশী যেনো উপচে পড়ছে । থরথর করে কেঁপে উঠে রাজীবের সমস্ত শরীর । বুঝতে পারে সব কিছুই । মা ওর সুস্থ হয়ে ফিরে আসেনি ; শেষ সময়টা ছেলের সঙ্গে কাটাতেএসেছেন । কোনদিন মা আর আগের মত সুস্থ হবেন না । চিৎকার করে উঠে রজীব আশপাশের গাছপালা নদীনালা কাঁপিয়ে । গাছে বসে থাকা পাখীগুলো ভয়ে উড়ে

যায় রাজীবের চিৎকারে। তারপর মুহূর্তেই আবার ফিরে আসে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ওদের গায়ের অতি চেনা ছেলেটাকে ।যেন চিনতে একটু কষ্ট হয় ওদের আজ। কই আগে তো এমন করে কোনদিন এমনভাবে চিৎকার করেনি সে ! অতঃপর নদীর ঘাটেই মুর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে রাজীবের দেহ। ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যায় ছেলেকেও মায়ের সঙ্গে।

তারপর আর মাত্র দেড় মাস কাছে পায় মাকে রাজীব ।চারপাশে কি ঘটে যাচ্ছে, কে কোথায় কি করছে কোনকিছুর দিকেই মনোযোগ ছিলোনা রাজীবের। বাধ্য হয়ে মঝে মাঝে মায়ের কথাতেই এদিক-ওদিক যেতো। কোনদিন গিয়েই চলে আসতো। সমস্তটা সময়ই মায়ের সেবা করে কাটিয়ে দিতো রাজীব। ভেতরে ভেতরে অসম্ভব ভেঙ্গে পরলেও উপরে তা কাউকে বুঝতে দিতো না ও। মাকে গল্পের বই , খবরের কাগজ পড়ে শুনায় ছেলে । যখন মন বেশী খারাপ হয়ে যায় ; আর সহ্য করতে পারেনা , পুকুরঘাটে চুপ-চাপ বসে থাকে একা একা। প্রানভরে কেঁদে নিজেকে হালকা করে আবার ফিরে আসতো মায়ের কাছে।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে মনে হয় সেদিনের কথা। অথচ চৌদ্দটি বছর পার হয়ে গিয়েছে মায়ের মৃত্যুর। কোন কিছুই তো থেমে নেই ! আগের মত না হলেও চলছে। সবই তো চলছে !

তারপর কি হলো ? কে দেখাশুনা করলো তোমাকে ? এতক্ষনে প্রশ্ন করে স্বাতী

- এরপর বাবা আবার বিয়ে করেন প্রায় বছর তিনেক পরে। কলেজে যাওয়া শুরু করেছি। বাবার দূর সম্পর্কের খালাতো বোন ।ঢাকার যাত্রা বাড়ীতে থাকতো তারা। সেই মহিলার একবার বিয়ে হইয়েছিলো। বছর না ঘুরতেই সবাই টের পায় তার স্বামী হলো এক ধরনের" সাইকো "। মানষিক বিকৃতি ছিলো তার। এর আগেও নাকি একবার বিয়ে করেছিলো সে। যা লুকানো হয় সবার কাছে দ্বিতীয় বিয়ের সময়। বিয়ে করা বৌএর উপর মানসিক আর শারীরিক অত্যাচার করে এক ধরনের আনন্দ পেতো অসুস্থ লোকটা। তাই গতবারের মত এবারও তার বৌ তাকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু দিন পরেই টের পায় ইতি মধ্যেই বদমাসটার সন্তানের মা হতে চলেছে মহিলা। তাই কোথাও বিয়ে দেয়াও এত সহজ হচ্ছিলো না ।পাঁচ বছরের একটি মেয়ে নিয়ে বিয়ে হয় সেই মহিলার আমার বাবার সঙ্গে। আর তখন আমাদের চলে আসতে হয় ঢাকায় ।চার কামড়ার একটি বাড়ী আর সামনেই একটি পান-বিড়ির দোকান লিখে দেয় বাবার শ্বশুর বাবাকে।

আর এরপর আমি টের পেলাম তখন থেকেই বাবা আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে ।সেই ছোট্ট দোকানটায় অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রায় চৌদ্দ ঘন্টা খোলা রেখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন তিনি ।সেখনকার আয় থেকে আরো দুটো দোকানের মালিক হন তিনি। এভাবে বায়তুল মোকাররমে দুটো বেশ বড় কসমেটিকসের দোকান কিনে তার ব্যবসা সরিয়ে নিয়ে যান। সিদ্দীক বাজারে বিশাল বাড়ি মালিক হন। ড্রাইভার, বাড়ি গাড়ি সবই হয়। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় ক্ষমতাও বাড়তে থাকে। চরিত্রের হয় আমুল পরিবর্তন। রাস্তায় হোটেলে প্রচুর লোকের সালাম মিলতে থাকে ।পাড়ার সর্দারের ডানহাতে পরিনত হয় একসময়ের গ্রাম্য সহজ-সরল শাহ আলম।

সেই সুবাদে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে থাকে গুন্ডা-মাস্তান আর অন্ধকার জগতের মানুষের সঙ্গে। ক্ষমতাকে হাতের মুঠোয় আনবার এক নেশায় পেয়ে বসে শাহ আলমকে এবং প্রচুর ক্ষমতার অধিকারীও হন তিনি। এরপর নামের আগে একসময় পদবীও জুটে যায়। আর ধীরে ধীরে সবার কাছে মেম্বার সাহেব বলেই বেশী পরিচিতি লাভ করেন। আমার সত্যি জানা নাই বাবা আদৌ মেম্বার হয়েছিলেন কিনা ? কেনোই বা তাকে সবাই মেম্বার ডাকতো ?

প্রচুর লোক আসতে থাকে তার কাছে সাহায্যের আশায়। নিয়ে আসে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা। কাউকেই খালি হাতে কি খালি মুখে ফিরিয়ে দেন না। অত্যন্ত আপন জনের মত ব্যবহার করেন তাদের সঙ্গে। কারো কাছ থেকে সালামী নেয়া তো দূরের কথা , প্রয়োজনে নিজের পকেট উজার করে সাহায্য করেন ওদের। পয়সার তো কোন অভাবই নেই তখন তার ! তখন তার দরকার শুধু ক্ষমতার। ধীরে ধীরে তার নিজের এলাকায় নিজেকে গডফাদারে পরিনত করতে সক্ষম হয় শাহ আলম ।এর মধ্যে কেটে গিয়েছে আরো দশটি বছর। সেই মায়ের ঘরে আরো দুটি সন্তানের জন্ম হয়।

রাজীবের খাওয়া-পড়া, টাকা পয়সার কোন অভাব ছিলোনা। কিন্তু সে সংসারে ছিলোনা কোন ভালোবাসা। স্নেহ নামের বস্তুটি যেনো কর্পুরের মতই উবে মতই উবে গিয়েছিলো সেখান থেকে। যখন বাবা ঘরে আসতেন এক ধরনের নিস্তব্ধতার সৃস্টি হতো পুরো বাড়ীর মধ্যে। বিশাল ড্রইংরুমে বিদঘুটে চেহারার লোকদের যাতায়াত টের পায় রাজীব।

ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষে পড়ে রাজীব তখন। তখনই পরিচয় হয় জামান ভাইএর সঙ্গে। প্রচন্ড আদ্রর্শ আর নীতির যেন এক আইফেল টাওয়ার জামান ভাই। তার কাছেই বুঝতে শিখে জীবন কি ?দেশ আর মায়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই মাটি ,এই ভাষা , এর সমস্ত বালুকনার সঙ্গে মিশে আছে আমাদের সত্তা, আমাদের অস্তিত্ব। সমস্ত কিছুর বিনিময়ে হলেও একে ছিনিয়ে আনতে হবে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে। কখন কি ভাবে জানেনা প্রচন্ড এক ভালোবাসায় ভরে উঠে রাজীবের মন- প্রাণ। হৃদয়ের অতি গভীরে স্থান

করে নেয় এই মাটি-মা । মাকে হারানোর ব্যথা, বাবার বিকৃত কাজকর্ম সবই তুচ্ছ হয়ে যায় । তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এই দেশকে কিভাবে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা যায় ?

১৯৭১ এর মার্চ মাস । মাত্রই মিটিং শেষ করে বাসায় ফিরেছে রাজীব । ভেতরে ভেতরে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার সমস্ত প্রস্তুতি চলছে । ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায় সেদিন ওর । রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজে । পা টিপে টিপে ঢুকছিলো ওর ঘরে । হঠাৎ চোখে পড়ে তখনও বসবার ঘরে আলো জ্বলছে । কৌতুহল বসেই ভেরানো দরজটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় । অস্পষ্ট কথা ভেসে আসে ভেতর থেকে । দরজার চুলচেড়া ফাঁক দিয়ে চোখ লাগিয়ে দেখে পাঁচ-ছয়জন লোক নিয়ে বাবা বসে আছেন । প্রধানত তিনিই কথা বলছিলেন । হঠাৎই কানে ভেসে এলো একটি কথা । আর সজাগ হয়ে উঠলো রাজীবের ইন্দ্রিয় ।

- মেম্বার সাহেব , আপনি কি কন ? এই মুজিব মিয়া কিছু করবার পারবো ? আপনি কি মনে করেন ?

- আরে না ! কি যে কও মিয়া তোমরা ! কোন অবস্থায়ই পাকিস্তান ভাইঙ্গা বাংলাদেশ হইতে দিমু না । আমাগো শান্তি কমিটি কি ঘাস খাইয়া জীবন কাটাইতাছে ? যুদ্ধ যদি লাইগাই যায় তাগো না আছে অস্ত্র না আছে সৈন্য সামন্ত না ট্রেনিং ? কি আছে তাগো ? কিচ্ছু না ! আমাগো কিসের অভাব ? সবই আল্লায় দিছে আমাগো । বাঘের মতন ঝাপাইয়া পড়বো না সবাই ? চিন্তা কইরোনা মিয়ারা । যাও অনেক রাইত হইছে । বাইত যাও ।

যেন পাথর হয়ে জমে গেলো রাজীব সেখানে কিছুক্ষনের জন্য । কি শুনছে এসব ? ছিঃ ! ছিঃ !! ও জানতো বাবা ক্ষমতা এবং টাকার জন্যেই হন্যে হয়ে ঘুরছে ।এখন দেখছে তার চাইতেও জঘন্য পথে এগোচ্ছে ওর বাবা । হায় খোদা !! এখন কি হবে ? একই ঘরে বাস করছে দেশ প্রেমিক ছেলে ...যে দেশের জন্য প্রান দেয়ার জন্য নিজেকে তৈরী করছে ; আর একদিকে বাপ দেশোদ্রোহী !! দেশের যে পরি স্থিতি হতে যাচ্ছে ।তার থেকে মনে হচ্ছে একজনকেতো হার মানতেই হবে । নতি স্বীকার করতে হবে এক পক্ষকে ।

হঠাৎ করেই টের পেলো রাজীব ঘৃনা করে রাজীব ওর বাবাকে । খুব শিগ্রী যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে । তখন কি ভূমিকা নেবে ওর বাবা ?ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে রাজীবের।

সাত মার্চের বক্তিতার পর প্রকাশ্যেই ঘোষনা করে শাহ আলম নিজেকে মুসলিম লীগের কর্মী হিসাবে । গড়ে উঠে শান্তি কমিটির আর একটি শাখা । আর সে রাতেই রাজীব বাড়ী ছেড়ে উঠে আসে ইউনিভার্সিটিতে ওর বন্ধুর সঙ্গে রুম শেয়ার করতে । এর মধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ । যুদ্ধের জন্য সবাই মোটা-মুটি প্রস্তুত ।

পচিশ মার্চের পৈশাচিকতার পর চলে আসে ওরা দল বেধে এখানে । এখান থেকেই খোঁজ পায় রাজীব ওর বাবা রাজাকার বাহিনী গঠন করে সমস্ত রকমের সাহায্য সহযোগিতা করছে পাকিস্তানী বাহিনীর। ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয় কাফনের কাপড় আর চিঠি । তৈরী হতে বলে শেষ মুহুর্ত্তের জন্য , আত্নীয় পরিজন সবার কাছে মাফ চেয়ে বিদায় নিয়ে নিতে । আর এর পরের সপ্তাহেই নিজের হাতে শেষ করে আসে রজীব ওর দেশদ্রোহী পিতাকে । একটুও হাত কাঁপেনি ওর ।আবেগের ছিটেফোটা স্পর্শ করেনি ওর হৃদয়ে । সেদিন স্টেনগানের পুরো ম্যগাজিনটাই খলি করে ঝাঝরা করে দেয় ওর জন্মদাতা পিতার বুকটা । এখনও বিশ্বাস করে রাজীব একটি সাজানো- গুছনো সুন্দর ফুলের বাগানের উটকো পরগাছা যেমন মালী শিকর সহ উঠিয়ে ফেলে । তেমনি দেশো দ্রোহীদেরও এভাবেই নিশ্চিন্ন করে দেয়াই প্রতিটা দেশপ্রমিকের সবচাইতে বড় কর্তব্য । তাহলেই সম্ভব হবে দেশকে মুক্ত করা ।

সেই থেকে এখানেই আছে । জীবনের প্রচুর চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কখন পাথর হয়ে গিয়েছে হৃদয়টা জানেনা ও । হাসতে ভুলে গিয়েছে । কবে শেষ কেঁদেছে মনে নেই রাজীবের । রক্ত-মাংসের একটা শরীর নিয়েই শুধু বেঁচে আছে । আর বাকী সমস্তটুকুই বোধহয় পাথর হয়ে গিয়েছিলো ওর । মা নেই ,বাবা নেই , ঘর সংসার নেই । ঠিকানাবিহীন । নেই কোন পিছুটান । বেপোরোয়া এই জীবনের পুরোটাই এই ছন্নছাড়া দেশটার জন্য বিলিয়ে দিয়েছে রাজীব ।

আশ্চর্য হয়ে যায় মাঝে মাঝে নিজের অতীতের দিকে তাকালে । ছোট বেলার সেই রাজীব!মা-বাবার সেই আদরের সোনাপাখী রাজীব !! আজলাভরে যে শুধু ভালোবাসা নিতে জানতো , আজ তার একি পরিবর্তন ? ক্যাম্পের প্রতিটা মানুষ ভয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না । কিছু জিজ্ঞেস করলে গুছানো উত্তর উলটা-পালটা হয়ে যায় । প্রচন্ড এক কঠিন ব্যক্তিত্বের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছিলো রাজীব নিজেকে অনেকগুলো বছর । কিন্তু সেই পাথরের বুক চিরে কোথা থেকে যেনো হঠাৎ করেই সৃষ্টি হলো এক ঝর্নাধারার । সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতই যেন আবার সেই লুকিয়ে থাকা ভালোবাসা ডানা মেলা প্রজাপতি হয়ে চারপাশে খেলে বেড়াচ্ছে রাজীবের চারপাশে ।

স্বাতী নামের একটি মেয়ে এসে জীবনের পুরো ছকটাই বদলে দিয়েছে রাজীবের । আজকাল রাজীব বহুবছর পর প্রানখুলে হাসতে পারছে । মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান গাইতেও শোনা যাচ্ছে ওকে ।

"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি ,
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ...।

আর একদিন আড়াল থেকে রাজীবের দলের কয়েকজন শুনতে পায় গাইছে

তুমি একজনই শুধু বন্ধু আমার
শত্রুও তুমি একজন
তাই তোমাকেই ভালো লাগে !!!

অবাক হয়ে শুনলো সবাই । কি অপূর্ব গানের গলা রাজীবের ! সবাই নিঃসন্দেহ হলো এবার রাজীব আর স্বাতীর ভালোবাসা নিয়ে । ঠাট্টা করে মাসুদ একদিন বললো ওদের দলের সবাইকে–

-যা বেটা এইবার তর যুদ্ধ মনে হয় মাথায় উঠবো! তোমার মনের বারোটা বাজছে রাজীব মিয়া!!

সবাই হো হো করে হেসে উঠে মাসুদের রসিকতায় ।

কিন্তু না । তার কানাকড়িও সত্যি ছিলোনা । চরিত্র আর হাব-ভাবের আমূল পরিবর্তন হলেও কমান্ডার হিসাবে রাজীব আগের মতই কঠোর । যুদ্ধের মাঠে ওর অন্য মূর্তি । আর সবচাইতে আশ্চর্য ! তখন স্বাতীকেও যেন চেনা যায় না । দলের সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখে ওদের দুজনের কঠিন দেশপ্রেম ! যেন তখন স্বাতী আর রাজীব অন্য এক স্বাতী আর অচেনা এক রাজীব হয়ে যায় । চোখে মুখে প্রচন্ড ঘৃনা ।একফোটা হাত কাপেনা স্টেনগান চালাতে । উল্লাসে চিৎকার করে উঠে এক একটা মিশন সফল করে ক্যাম্পে ফিরে এসে । এমনভাবে ঘসে ঘসে সাবান দিয়ে হাত ধোয় যেন কতগুলো দুর্গন্ধযুক্ত কীট -পতঙ্গ হাতে টিপে হত্যা করে এসেছে । তার দূষিত রক্ত হাত থেকে ডলে ডলে তুলে ফেলবার চেষ্টা করে ।পরিতৃপ্তি নিয়ে রাতের আহার করে সবাই ।

বিছনায় গা এলিয়ে দিতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় ওরা । দেখলে কেউ বলবে না ঘন্টাখানেক আগেও ওরা খেলে এসেছে জীবন-মরন যুদ্ধের খেলা !

এমনিভাবে সাতটি মাস পার হয়ে যায় যুদ্ধের । আশা আর নিরাশার মধ্যে কাটে প্রতিটা দিন রাত্রি । এর মাঝেও যখনই সময় পায় পুকুরপারে গিয়ে বসে দুজন । সমস্তকিছু ভুলে নিজেদের কথাই বলে তখন ওরা । কি এক গভীর ভালোবাসায় কাছে টেনে নেয় রাজীব স্বাতীকে । ছুঁয়ে দেখে স্বাতীর রেশমী কোমল চুলের গোছা । কখনও হাতে তুলে নেয় একটি কোমল হাত । প্রবল আবেগে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে শ্বাশ্বত বঙ্গ নারী । আর দশটা মেয়ের মতই হয়ে যায় তখন ও । টের পায় কি ভয়াবহ অবস্থা হবে যদি রাজীব ওর জীবন থেকে বিদায় নেয় ? কিন্তু এই পরিস্থিতে তো যে কোন সময় এটাই সবচাইতে স্বাভাবিক ।আবার তার উল্টোটাও ঘটতে পারে ।কান্না থামাতে পারেনা স্বাতী ।

আস্তে করে হাত রাখে রাজীব স্বাতীর মাথায় ।

স্বাতী , আমার বিশ্বাস , আর খুব বেশীদিন নেই এই দেশ স্বাধীন হবার । আমরা যদি বেঁচে থাকি আমাদের সংসার হবে মুক্ত বাংলাদেশে ।স্বাধীন মাটিতে জন্ম নিয়ে খেলে বেড়াবে আমাদের সন্তানেরা । আর যদি বেঁচে না থাকি , নিশ্চই একদিন ওপারে দেখা হবে ।তাইনা স্বাতী ? সেখনে আমি তোমাকে আমার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো । বলবো - দেখো মা তোমার মত আর একজনকে নিয়ে এসেছি । মা তোমাকে অনেক আদর করবেন কারন তুমি যে হবে তার রাজীব সোনার বৌ !

ডুকরে কেঁদে উঠে স্বাতী । তারপর সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে উঠে চলে যায় ও । আর তার পরদিন সকালে উঠে আর রাজীবের সঙ্গে দেখা হয়নি স্বাতীর ।

হঠাৎ করেই জরুরী একটা মিশনে খুব সকালে ছুটতে হয় রাজীবদের দলটা ।শেষ রাতে ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছিলো স্বাতী । তাই রাজীব আর স্বাতীকে ডেকে তুলেনি ।

পরদিন ভোররাতে পাঁচজন ফিরে আসে সঙ্গে আরো দুজনের লাশ নিয়ে । বাকীরা নাকি ছড়িয়ে যায় । তিনজন ধরা পরে পাকিস্তনীদের হাতে ।দলের কেউ সঠিকভাবে রাজীবের খবর দিতে পারলো না।

জীবনের এতবড় ধাক্কাটার জন্য তৈরী ছিলোনা স্বাতী । ভেবেছিলো যদি মরতে হয় দুজন এক সঙ্গেই মরবে ।কিন্তু সত্যি কি রাজীব বেঁচে নেই ? এত সহজে রাজীব হার মেনে যাবে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় স্বাতীর । কিন্তু একমাস পর্যন্ত যখন ফিরে এলোনা ,ধরেই নিলো আর ফিরে আসবেনা সে । লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কাঁদলো স্বাতী । ঘন্টার পর ঘন্টা পুকুর পারে বসে থাকলো একা একা ।এক সময় শুকিয়ে গেলো চোখের জল।তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো জাত দেশ প্রেমিকা । প্রতিশোধের আগুন নিয়ে দ্বিগুন উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর উপর । নূতন নূতন ছেলেরা এসে যোগ দিচ্ছে দলে । মঝে মাঝে দু-একটা মেয়েও আসছে । হঠাৎ একদিন চমকে উঠলো শাওনকে দেখে । মিনু খলার একমাত্র ছেলে শাওন ।

- ওমা ! তুমি এখনে কবে এলে শাওন ভাই ?

-এই তো গত সপ্তাহেই । মা পাঠিয়ে দিলেন ।সালেহা খালার কাছে শুনলেন তুমি যুদ্ধে এসেছো ।তাই বললেন -

- তুইও যা , ছেলে হয়ে ঘরে বসে না থেকে যা স্বাতীর ওখানে চলে যা । দেশের জন্য যুদ্ধ কর । দেশ স্বাধীন করে আয় ।

বলে খুব কাঁদলেন মা । এখনে এসে তোমাকে খুজে পেতে একদমই কষ্ট হয়নি ।নাম বলতেই কয়েকজন এসে পৌছে দিলো জানো ? পলাশ ভাইয়াও আসবেন আগামী মাসে । অপেক্ষা করছেন বাচ্চার মুখ দেখেই নাকি আমাদের দলে এসে যোগ দেবেন । আগামী মাসে ভাবীর বাচ্চা হবার তারিখ জানিয়েছে আবেগে আর খুশীতে চিৎকার করে

উঠল স্বাতী । উহ!!! কি যে খুশী লাগছে না আমার!কেউ বসে থাকবেনা দেখো । দরকার হলে আমি মাকেও নিয়েআসবো এখানে । মা জানেন সেটা।

কিন্তু তার আর দরকার হলো না । সপ্তাহ খানেক পরই স্বাধীন হয়ে গেলো বাংলাদেশ। পাগলের মত ঘরে ফিরছে সবাই নীড়ে ফেরা পাখীর মত । স্বাতীর মনেও অনেক আনন্দ ! কিন্তু তার সঙ্গে হৃদয়ের একটা কোন দিয়ে যেন রক্তক্ষরন হচ্ছে । কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারছেনা তাকে । ভুলতে পারছেনা রাজীবকে স্বাতী।

মুক্ত দেশের মুক্ত বাতাসে কিসের যেন বেদনার গন্ধ! কোন একটা দোকানে গান বাজছে

যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে
লক্ষ মুক্তি সেনা
দেনা আমায় দেনা ,
সে মাটি আমার
অঙ্গে মাখিয়ে দেনা!!!

কি অপূর্ব সে সুর , আর গানের কথা ! আনমোনা হয়ে যায় ক্ষনে ক্ষনে স্বাতী । দুচোখের পানিতে সিক্ত হয়ে যায় দুতো গাল । সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যেন একটি মুখই স্বাতীর চোখের সামনে ভেসে উঠে । সে মুখ স্বাতীর অনেক চেনা , অনেক প্রিয় !সে মুখ রাজীবের । যতই ভাবতে থাকে ততই যেন ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে স্বাতীর হৃদয় ।

ব্যথা- আনন্দের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ঘরে ফিরলো স্বাতী । অনেক রোগা হয়েছে ও। হাতে- পায়ে অজস্র কাটা-ছেড়ার দাগ । চুলগুলো ছোট করে ছাটা । হঠাৎ দেখলে চেনা যায়না। জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে সালেহা বেগম ।

বাবা-ভাই-ভাবীরাও বাদ গেলো না ।খবর পেয়ে ছুটে এলেন মিনু খালা ।কেঁদে-কেটে বুক ভাসালো সবাই আনন্দে। রাতে খেয়ে-দেয়ে বিদায় নিলো সবাই ।

ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে নিজের ঘরের পরিচিত বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাতী । নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনা । ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে ।

দড়জায় দাঁড়িয়ে সবই দেখলেন মা। অনেকক্ষন কেঁদে শান্ত হওয়ার পর আস্তে আস্তে এগিয়ে পাশে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন মেয়ের ।একটু যেন চমকে উঠলো স্বাতী ।তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসলো বিছানায় । নিজেকে সামলে নিলো । গল্প করলো যুদ্ধের দিনগুলোর ।বাদ দিলোনা রাজীবের কথাও ।স্বাতীর মত মায়েরও চোখ ভিজে উঠলো বারবার কাহিনী শুনতে শুনতে। কোন শান্তনা বানী খুঁজে পেলেন না তিনি মেয়েকে শোনাবার মত।

মাইকে ফজরের আযান শুনে চেতনা ফিরে এলো ।অজু করে জায়নামাজে দাড়ালেন । অনেক সময় নিয়ে নামাজ পড়লেন । কতক্ষন কোরাআন তেলাওয়াত করলেন ।তারপর হৃদয়ের গভীর থেকে নিঙরানো মমতা দিয়ে দুহাত তুলে প্রার্থনা করলেন সৃষ্টিকর্তার কাছে । -

হে খোদা ; তোমার কাছে দেশ চেয়েছিলাম তুমি দেশ দিয়েছো । কোন কৃপণতা করনি । তোমার কাছে আমার আজকের ফরিয়াদ - আমার মা স্বাতীর মনটা তুমি শান্ত করে দাও । আমার সোনামনির হাসি তুমি ফিরিয়ে দাও । বলতে বলতে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন সালেহা বেগম । অনেকক্ষণ কেঁদে মাথাটা ভারী হয়ে যায় । জায়নামাজে শুয়েই কখন চোখটা লেগে আসে ।

চমকে জেগে উঠেন সালেহা বেগম টেলিফোনের শব্দে । এত সকালে কে ফোন করলো ? নিশ্চয়ই বিথী ?

- হ্যালো?

মা ,আমি বিথী । তোমরা কেমন আছো ?স্বাতী কি করছে

হ্যাঁ । এইতো গত রাতেই ফিরলো।

-আমি আসছি মা।আজই রওয়ানা দিচ্ছি ।

-হঠাৎ করে?

হঠাৎই আসতে হচ্ছে । এসে সব বলবো ।

দুই দিনের মাথায় এসে পৌছালো বিথী ।সড়াসরি মায়ের বাসায় ।

স্বাতী কোথায় মা?

ঘুমাচ্ছে ।

- আচ্ছা থাক ।ওকে ডেকোনা এখন। আমরা ঘুরে এসে কথা বলবো ওর সঙ্গে ।

- মাত্র এলি এত দূর থেকে । এখনই কথায় যাচ্ছিস ?

এসে বলবো তোমাকে সব মা । চলো রবিন । বলে দুজন বেড়িয়ে গেলো সালেহা বেগমকে অসম্ভব অবাক করে দিয়ে ।

ঘন্টা দু-এক পর ফিরে এলো বীথি ।সমস্ত চেহারায় খুশী যেন উপছে পড়ছে ওর ।খুশীতে চিৎকার করে কথা বলছে , হাসছে চিৎকার করে । জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে বোনের মুখ ।যন্ত্রের মতই সাড়া দেয় স্বাতী । খুব অবাক হয় বিথি । স্বাতীরই তো সবচাইতে খুশী থাকার কথা এখন । নিরিবিলিতে মাকে জিজ্ঞেস করে কারন । সমস্তই খুলে বলেন মা সালেহা বেগম। বিষন্নতায় ভরে আছে মায়ের মনটাও।

-এখন কি হবে বীথি ?আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

- সব ঠিক হয়ে যাবে মা । এতদূর থেকে তাড়াহুরো করে আমার ছুটে আসার অনেক কারন আছে । সংক্ষেপে কিছু কথা খুলে বলে বীথি মাকে । তারপর একটা ছোট প্যাকেট নিয়ে ঢুকে স্বাতীর ঘরে । ভেতর থেকে ভিড়িয়ে দেয় দড়জাটা ।

পাশ ফিরে শুয়ে ছিলো স্বাতী । জানালায় আকাশ দেখছিলো ।আকাশে তুলার মত অজস্র মেঘ ভেসে যাচ্ছে এখান থেকে ওখানে । সমস্ত আকাশ জুড়ে খুঁজছে স্বাতীর দুটো চোখ একজনকে । মেঘগুলো জোড়া দিয়ে চেষ্টা করছে

একটি প্রিয় মুখ বানাবার। কিন্তু বারবার ছুটে যাচ্ছে মেঘগুলো এখান থেকে ওখানে । টুকরো টুকরো ফেলে আসা স্মৃতিগুলো এসে ভীর করছে ক্ষণে ক্ষণে ।

বীথি এসে বসলো বোনের পাশে । চোখদুটো তখনও ভেজা স্বাতীর । আস্তে করে হাত রাখলো বীথি স্বাতীর মাথায়। ঝাপিয়ে পরলো বোনের কোলে স্বাতী । হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো ।

-আপু , আমি পারছিনা ।আমি মরে যাচ্ছি আপু । ফুলে ফুলে কাঁদছে স্বাতী ।কাঁদছে বীথিও ।বুকের গভীর থেকে উঠে আসছে সে কান্না । সময় দিলো বোনকে। তারপর বললো -

- উঠ স্বাতী । উঠে বস । আমি এতদূর থেকে তোর জন্যই এসেছি । একটু শান্ত হ বোন ।

আস্তে আস্তে উঠে বসলো স্বাতী । প্রশ্ন নিয়ে তাকালো বোনের দিকে,দেখতো এই ছবিগুলোর মানুষটাকে চিনতে পাড়িস কিনা?

বিস্মিত হয়ে হাতে নিলো প্যাকেটটা । চোখের সামনে মেলে ধরলো একটা একটা করে ছবিগুলো । প্রথমে চিনতে অসুবিধা হলো ।তারপর বললো-

আপু , সেই লোকটা না ? যার ছবি তুমি গত বছর দেখিয়েছিলে ?হ্যাঁ সেই তো ! কিন্তু এতো যুদ্ধের ছবি আপু ? এই ছবি কোথায় উঠানো?

কেনো তুই চিনতে পাড়িস না কোথায় উঠানো ?

- মনে তো হয় , হ্যাঁ ঐ তো পেছনে লেখা প্রাইমারী স্কুল যশোর ।তার মানে এ ছবি যশোরে উঠানো? কিন্তু আমি তো জানি এই ভদ্রলোক থাকেন তোমাদের ওখানে আমেরিকাতে । আর এই গ্রুপের ছবিটা ? সবার হাতে ষ্টেনগান ।আর এটাতো সড়াসরি যুদ্ধের ছবি । এসব ছবি তুমি কোথায় পেলে আপু ?

- এখনও তুই বুঝতে পারছিস না?

- না কি বুঝবো ?

- ইকবাল ভাই । সব ছেড়ে ছুড়ে জুন মাসে চলে আসে বাংলাদেশে । যোগ দেয় মুক্তিবাহিনীতে । যশোরের বর্ডারে এই ছয় মাস যুদ্ধ করেন । আমরাও জেনেছি কয়েক মাস পরে । একমাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন ।যুদ্ধে গিয়ে অসম্ভব আহত হন । বুকের ডানপাশ ঘেসে গুলি বেড়িয়ে যায় অনেকটা জায়গা কেটে নিয়ে । সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করা হয় ইন্ডিয়ার কোন একটা হাসপাতালে । যমে মানুষে টানা-টানি চলে এই কয় সপ্তাহ । গত সপ্তাহেই স্থানান্তরিত করা হয় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে । আমি এই মাত্র এলাম সেখান থেকে। ডাক্তার বলেছে" , কোন রকমে টিকে গিয়েছে এই দফা ।নার্ভের জোড়ে আর ইচ্ছা শক্তিতেই নাকি এটা সম্ভব হয়েছে । চল । যাবিনা স্বাতী ?

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলোনা স্বাতী । তাকিয়ে রইলো বোনের দিকে । তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁরালো । স্যান্ডেলটা পায়ে গলিয়ে বললো ,চলো আপু।

ওরা এসে পোঁছালো হাসপাতালে । দুরু দুরু বুকে ঢুকলো স্বাতী বিথির পেছন পেছন ২০৫ নাম্বার রুমে । ধব-ধবে সাদা বিছানায় গলা পর্যন্ত ঢাকা চাদরে শুয়ে আছে ইকবাল । অসম্ভব ক্লান্ত চেহারা । চোখ দুটো বোজানো ।

ধীরে ধীরে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো দুই বোন ।

-ইকবাল ভাই, দেখেন কাকে নিয়ে এসেছি ।

চোখ মেলে তাকালো ইকবাল । আশ্চর্য্য সুন্দর দুটো উজ্জল চোখ ইকবালের ।তাকিয়ে থাকতে পারছেনা স্বাতী।

-আপনারা কথা বলেন । আমি একটু ঘুরে আসছি ।

নীচের দিকে তাকিয়ে আছে স্বাতী ।চুপচাপ কেটে গেলো কয়েকটা মুহূর্ত ।

-এদিকে এসো স্বাতী ।

-আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো স্বাতী ।

-তাকাও আমার দিকে ।

সম্মোহিতের মতই চোখ তুলে তাকালো ও ।

- স্বাতী , আমি সবকিছু ফেলে চলে এসেছি । পুরো ছয়টা মাস যুদ্ধ করেছি অক্লান্ত ভাবে । যেভাবেই হোক এ দেশটা আমার পেতে হবে । কারন দেশ না পেলে যে আমি আমার স্বাতীকে হারাবো! দেশকে পেতে পেতে নিজেকেই প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম । কোন রকমে ফিরে এসেছি তোমার জন্য । কি ঠিক করিনি স্বাতী?

তুমি কাঁদছো কেনো স্বাতী ? এখন তো আমাদের খুশীর সময় । বলো , আমি ঠিক করিনি?

কথা বলতে পারছেনা স্বাতী। উপর-নীচে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে ।

-এখন তো আর তোমার কোন আপত্তি নেই তাইনা স্বাতী ? দেশকে পেয়েছি । এখন কি আমার স্বাতীকে আমি পেতে পারি ? এত দূর থেকে এসে ভুল করিনি তো আমি ?

ইকবালের বিছানার পাশে গিয়ে বসলো স্বাতী । একটা হাত তুলে নিলো নিজের হাতে । অঝোর ধারায় কাঁদছে স্বাতী। কাঁদছে ইকবালও । অসম্ভব সুখের কান্না ! তারপর দুর্বল হাতে স্বাতীর মাথাটা টেনে নিলো নিজের বুকে । স্বাতীর চোখের জলে ভিজে গেলো ইকবালের বুকে বাঁধা ব্যান্ডেজ।

-০-

নিউ ইর্য়ক
মার্চ০১, ২০১১

অলংকরণঃ মনজিলুর রহমান